A PAGAN DOCTRINE FROM
ANCIENT TIMES PREVALENT UNTIL TODAY

THE RELIGION OF DARWINISM

ডারউইনবাদ ধর্ম

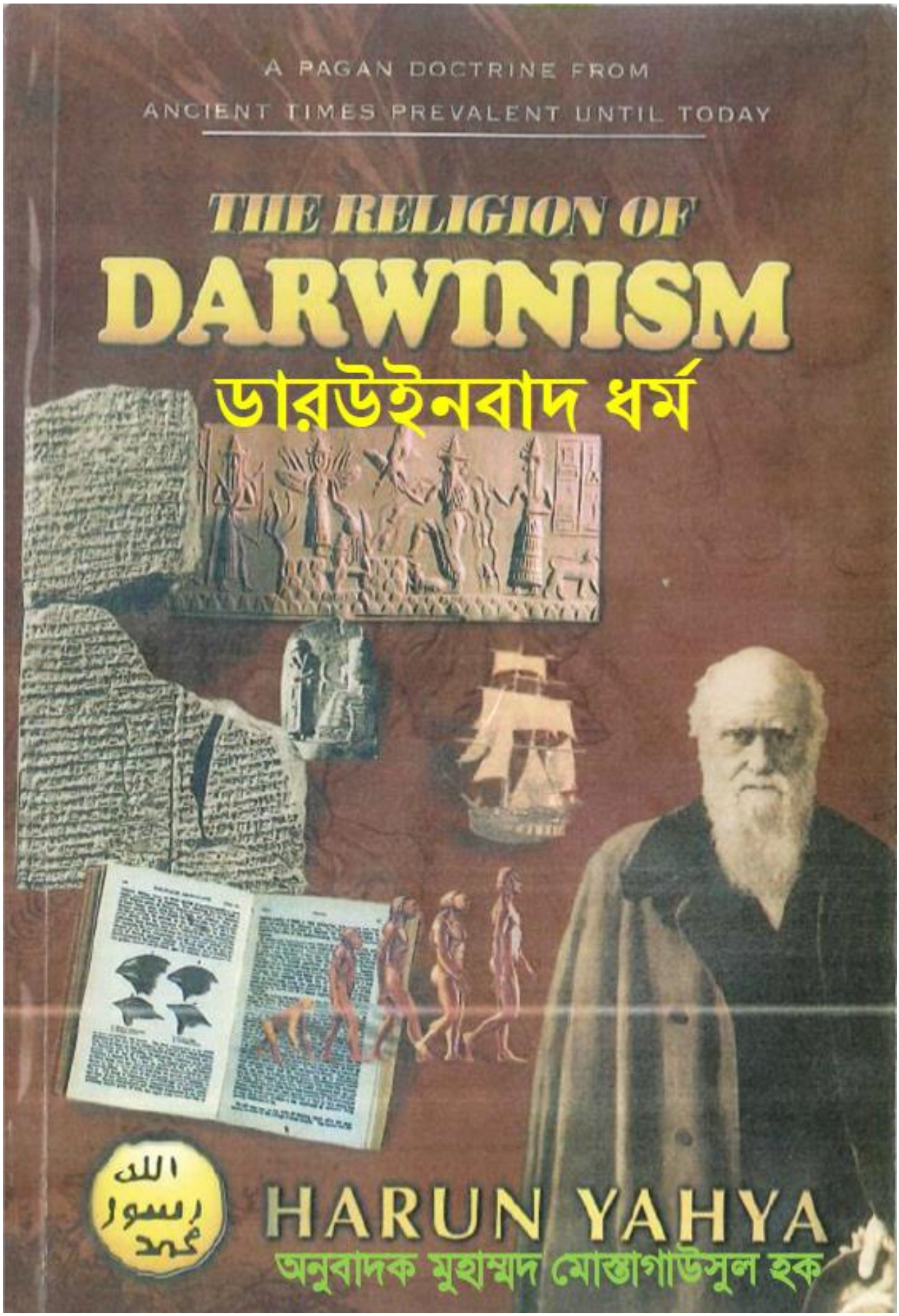

HARUN YAHYA

অনুবাদক মুহাম্মদ মোস্তাগাউসুল হক

অনুবাদকের কথা

সৃষ্টিকর্তা, এই ভ্রমান্ডের যা কিছু আমাদের গোচরে এবং এখনো অনেককিছু যা আমাদের অগোচরে রয়ে গেছে সবকিছুর রুপকার, সৃজনকার। তিনি আল্লাহ সুবহানা ওয়াতায়ালা, মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর সৃষ্টির শ্রেষ্ট জীব হিশেবে (আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতর অবয়বে, (কুর'আন ৯৫, ৪)। সবকিছু যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁকে নিয়ে পৃথিবীতে প্রচলিত ধর্মগুলোর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। সন্দেহ নেই সৃষ্টি কর্তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়েও।

ডারউইনবাদ এর বৈজ্ঞানিক তত্বের উপর রয়েছে বিশাল বিতর্ক দুনিয়া জুড়ে কিন্তু এরও উপরে ডারউইন এর তত্ববাদীদের ধর্মবীরুদ্ধ যে অবস্থান বা তাদের নাস্তিকতা, সমাজে সেটার প্রভাবটাই মুলত জোরালো। এরা নানাভাবে এবং শক্তভাবে সমাজে প্রভাব বিস্তার করছে। নিউটন, আইনস্টাইন এঁদের তত্বকে সমাজ গ্রহন করেছে বিজ্ঞানের আলোকে এবং এখানে কোন জোর জবরদস্তি নেই এবং কোন অযাচিত গোষ্ঠিও নেই এইসব তত্বের প্রসার ও প্রচারণার জন্য। ডারউইনবাদীদের বেলায় তা ভিন্ন। কেন ভিন্ন তার মুল কারণই হোল এরা ডারউইনবাদকে ধর্ম হিশেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। আর এটা নিয়ে সব ধর্মের বিশ্বাসীদের মধ্যে রয়েছে অস্বস্তি এবং প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদ যুক্তি তর্কের- তাত্বিক এবং বৈজ্ঞানিক পরিভাষায়।

বাংলা ভাষায় নাস্তিকতা বিষয়ে কিছু প্রকাশনা দেখেছি (দুই বাংলা মিলিয়ে) কিন্তু ডারউইন এর বিবর্তন এর তত্বের উপর কোন মৌলিক লেখা বা অনুবাদ আছে কিনা জানি না। সেই ধারণায় হারুন ইহাহিয়ার এই সাধারন, প্রাঞ্জল এবং শক্তিশালী যুক্তির উপর লিখিত বইটি বাংলায় ভাষান্তরের চেষ্টা শুরু করি এ নিয়ে কোন পুর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়াই, কেবলই আমার বিশ্বাস এবং আমাদের সমাজে এর প্রয়োজনের কথাটি মাথায় নিয়েই উদ্যোগটি শেষও করি। তবে সত্য হোল উদ্দেশ্যের দিক থেকে উদ্যোগটি শুরু হোল মাত্র, এর ধারণা এবং আদর্শের ব্যপ্তি ও প্রসারটাই হোল মুল কাম্য। ইংরেজী ভাষায় হারুন ইয়াহিয়ার প্রাঞ্জলতা, সরলীকরণ বাংলা ভাষায় একইভাবে সাধারনিকরন আমার জন্য ছিল দুরুহ কাজ। বার বার পড়েও এর প্রাঞ্জলতা নিয়ে বিশাল সন্দেহ নিয়েই শেষ করলাম।

(ফিলিপ ই জনসন এর বই কাঠগড়ায় ডারউইন – Darwin on Trial এর মুখবন্ধে মাইকেল বেহে লিখেছেন – "সাধারনভাবে যেসব প্রমাণাদি উপস্থাপিত হয়েছে ডারউইনএর বিবর্তন তত্বের পক্ষে, সেসব যেভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে বা প্রচার পেয়েছে তা তার থেকে অনেক কম পরিমাপের। যদি ডারউইনবাদ সত্যই হয়ে থাকে, তাহলে দুই প্রজাতির ফিঙ্গে পাখির সামান্য ঠোটের ভিন্নতা মনে হয় দুর্দান্ত স্বীকৃতি এই তত্বের পক্ষে। আর যদি তা সত্য না হয়, তাহলে ধরে নিতে হবে যে দুটি আলাদা পাখিই কেবল বিদ্যমান যাদের ঠোটের মধ্যে আছে সামান্য পার্থক্য, আর তাহলে এই প্রশ্ন থেকে যায় যে প্রথমত তাহলে কি কারনে ফিঙ্গে পাখির উৎপত্তি হোল। শিঘ্রই ডারউইনবাদের উপর সন্দিহানরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে আধুনিক দুনিয়ার বেশীরভাগ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি শক্ত বৈজ্ঞানিক প্রমাণাদির উপর নির্ভরশীল নয়, বরং নির্ভর সামাজিক কুসংস্কার প্রভাবান্বিত পক্ষপাতময় দর্শনের উপর।

তত্ব ও তথ্যের উপাত্ত হিশেবে ডারউইনবাদ মোটামুটিভাবে তিনটি বিষয়ের উপর জোর দেয় - পরিবর্তন বা মিউটেশন, জীবাশ্ম – ফসিল, আর জীবের উৎস – অরিজিন অব লাইফ।

ডারউইন এর বিবর্তনবাদ তত্বের মুল খোরাক হচ্ছে - যথেচ্ছ পরিবর্তন – র‍্যানডম মিউটেশন। প্রজনন শাস্ত্রের গভীরে কিছু কিছু জীবের পরিবর্তন জন্মগত ভাবেই পার্থক্য আনে পুর্বপুরুষ আর উত্তরাধিকারদের মধ্যে। সাধারণভাবে এই পরিবর্তন পরিবর্ধন এর চেয়ে নিম্নমানের দিকেই এগুতে থাকে মুলত যেহেতু জীবের মধ্যে ডিএনএ'র কার্যক্রম বেশ সক্রিয়। সময়ের আবর্তে এই দুর্বল জীব প্রকৃতির নির্বাচনে – ন্যাচারাল সেলেকশন, অবক্ষয়িত হয়ে হারিয়ে যায়। ১৯৯০ সাল পর্যুন্ত এই ধারনাটা ছিল মুলত কল্পনাভিত্তিক কিন্তু এই সময়ের পরে নুতনভাবে আবিস্কৃত, ডিএনএকে অনুক্রম করার প্রক্রিয়া যা বিবর্তন এর পদ্ধতিকে নিয়মমাফিক গবেষণাগারে পরিচালনা করা যায়, আর অবিকল পরিবর্তন (এক্সাক্ট মিউটেশন) যা জীবকে উত্তরণ ঘটায় তার একটি প্রকৃত রূপ অনুসরণ করা যায়। আর এই পরীক্ষায় তাহলে কি পাওয়া গেল? মিশিগান ষ্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের রিচার্ড লেনস্কি – Richard Lenski, একজন জীবাণু বিজ্ঞানী, সিদ্ধান্ত নিলেন যে তার বিশাল গবেষণাগারে তিনি সাধারন ব্যাকটেরিয়া ই-কলি'র চাষ করবেন। যেহেতু এটা খুবই ছোট এর প্রজনন ক্ষমতা অনেক দ্রুত (১ ঘণ্টারও কম) এবং বহুল সংখ্যায় তৈরী হয় (কোটি কোটি মাত্র একটি টেস্ট টিউবে)। লেনস্কি এবং তার সহকারীরা একটি থেকে আর একটি টিউবে স্থাপন করে এসবের বেড়ে উঠাকে পুনারাবৃত্তির মাধ্যমে অসংখ্য ব্যাকটেরিয়ার জন্ম ত্বরান্বিত করেন। আর ব্যাকটেরিয়া হিশেবে এখানে প্রায়

৫০,০০০ প্রজন্মের ক্রমসঞ্চিত বংশের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় হাজার হাজার কোটি! এটা আদিম কোন পুর্বপুরুষের আধুনিক মানবের বিবর্তনের সময়কাল হিশেবে ধরে নেয়া যায়।

এই অনুক্রমিক ধারায় লেনস্কি ও তার সহকর্মিরা দেখলেন ব্যাকটেরিয়াগুলির উন্নতি হচ্ছে এবং সেসব শুরুর গুলোর থেকে আরও দ্রুতগতিতে বংশ বিস্তার করছে। তবে তাক লাগানোর ব্যাপার হোল উন্নীত ব্যাকটেরিয়াগুলো ভেঙ্গে অনেক জিনস(প্রানের গঠন সংকেত) তৈরী করেছে এবং অন্যদেরকে সরিয়ে দিয়েছে বা নির্গত করেছে। যেমনটি ডুবন্ত জাহাজ থেকে মুল্যবান এবং দরকারী অথচ ভারী কম্পিউটার বা মেশিনপত্র সমুদ্রে ফেলে দেয়া হয়। এই দরকারি বা কার্যকর ব্যাকটেরিয়ার নির্গমন পরিবর্তনশীল ব্যাকটেরিয়ার বেড়ে উঠাকে ত্বরান্বিত করে তাদের সহপাঠিদের থেকে কিন্তু এটা কোন ভাবেই কার্যকর বা দরকারী জিন এর উৎপত্তির উৎসের কারণ খুজে দেয় না, কিভাবে বা কোথা থেকে এটা আসল! অবশেষে, ৫০,০০০ প্রজন্মের পরও, না একটি নুতন জীবের উদ্ভব হোল, বরং উল্টো মুল জীবের অবয়বে ঘাটতি ঘটে গেল। আর এই মুহুর্তে আমাদের উত্তম উধাহরন হোল যে যথেচ্ছ পরিবর্তন এর সামর্থটা কিঃ যার বেশীরভাগই ক্ষতিকর আর অল্প যা উপযোগী সেসব জিন ভেঙ্গে ফেলছে''।

জীবাশ্ম বা ফসিল নিয়ে ফিলিপ জনসন যা তার বই 'ডারউইন কাঠগড়ায়' উল্লেখ করেন তা বলতে গিয়ে মাইকেল বেহে তার মুখবন্দে আরও লেখেন এভাবেঃ ''ফসিল নিয়ে ডারউইন তার বই দা অরিজিন অফ স্পেসিস এ যা বুঝাতে চেয়েছেন ১৯৯০ পর্যুন্ত জীবাশ্ম তথ্যের মধ্যে তার প্রত্যাশার প্রতিফলন নেই। বিবর্তনকালীন সময়ের অবয়বের দুস্প্রাপ্যতা, অসাম্যতা এবং অস্থিতিশীল বিতর্ক, ক্যাম্ব্রিয়ান এক্সপ্লশান, অনবরত বদলে যাওয়া অবস্থান এবং কেলেঙ্কারী- যা দাবি করা হচ্ছিল আদিম মানবের জীবাশ্ম হিশেবে সবকিছুই কঠিন সন্দেহের উদ্রেগ করে, আসলে ডারউইনবাদ হচ্ছে বৈজ্ঞানিক দুর্গের চেয়ে প্রতারনার বৈজ্ঞানিক গ্রাম। এর পরেও যারা খবরের কাগজ এবং টেলিভিশন দেখেন তারা জানে যে প্রতিনিয়ত গত কয়েক দশক ধরে এসব প্রচার করা হচ্ছে।

সাম্প্রতিক দুটি জীবাশ্ম আবিষ্কারকে বিশালভাবে প্রচারিত করা হয়েছে। ২০০০ সালের মাঝামাঝি বেশ কিছু জীবাশ্ম উত্তর-কানাডায় আবিষ্কৃত হয়, যা ছিল অদ্ভুদ মাছের মত দেখতে যাকে বলা হোল 'টিকটালিক'। বলা হোল এই জীবাশ্ম শত শত মিলিয়ন বছর আগের, যখন ভাবা হোত মেরুদণ্ড সম্পন্ন্য ডাঙ্গায় বাসকৃত প্রাণী 'টেট্রাপড' আবির্ভুত হয় নাই। অনেক বছর ধরে টিকটালিক কে মাছ এবং জমিনের মেরুদণ্ড সম্পুর্ন প্রাণীর মধ্যে বিবর্তনের স্তরে ফেলা হোল, কিন্তু ২০১০ সালে পোলান্ডে যখন আসল টিকটালিক এর পায়ের ছাপের জীবাশ্ম পাওয়া গেল যার বয়স ধরা হোল ১০ মিলিয়ন বছর আগের, কানাডিয়ান জীবাশ্মের মানব বিবর্তনের দাবিকে বিনা খোঁচায় তা হটিয়ে দিল। আর ৯১ এ যখন জনসন যুক্তি দিল তা মুলত টিকেই গেল যে জীবাশ্ম তার নিজের ইতিহাস বলতে পারে না আর এরই উল্টো দাবির উপরে ডারউইন তত্বের ৯৯ শতাংশ ভর করে আছে।

২০০৯ সালের মাঝামাঝি, ডারউইন এর ২০০ জন্ম বার্ষিকী এবং দি অরিজিন অফ স্পেসিস এর ১৫০ বছর পুর্তি উপলক্ষে এক বিশাল জীবাশ্ম আবিষ্কারের ঘটনাকে বিশাল প্রচারনার সাথে মাইকেল ব্লুম্বার্গ, নিউ ইয়র্ক শহরের মেয়র, উদ্বোধন করলেন বছরটাকে ডারউইন এর জন্মের উৎসব হিশেবে। সাইন্স ম্যাগাজিনে একটি নিবন্ধ, বই এবং ওয়েবসাইট বেরুলো সাথে তথ্যচিত্র। ঈডা – প্রাপ্ত জিবাশ্মের নাম,যাকে মানবের আদিম পুর্বসুরি বলা হোল। অল্পদিনের মধ্যেই কিছু একনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক এটাকে আবার নুতন বিবরণ দিলেন যে এই জীবের মানবের মত হওয়ার কোন যোগসুত্র নেই। আবারো, ঈডার উত্তেজনার কয়েক মাসের মধ্যে পাওয়া প্রায় একই রকম আর এক জীবাশ্ম নাম 'আরডি' আর এইসব জনসন (কাঠগড়ায় ডারউইন বই এর লেখক) এর যুক্তিগুলোকেই আরো প্রথিত করছে।

পৃথিবীতে জীবনের প্রথম দিকে, যখন ব্যাকটেরিয়া এবং এক কোষী জীব প্রধান্যে ছিল, ডারউইনওয়ালাদের ধারনার সঙ্গে তা কেবলই অদ্ভুদ থেকে অদ্ভুদতর। বিগত বিশ বছরে ডীএনএ ক্রমানুসার বিশ্লেষন এর বিশাল অগ্রগতির ফলে বিজ্ঞানীদের এই চিন্তার আধিক্যও অনেকাংশে বিকশিত হয়েছে। ক্রমেই ব্যপকাকারে জীববিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে আসছেন যে ডারউইন এর 'জীবন বৃক্ষের' ধারণা – যেখানে এক একক আদিম কোষ পরবর্ত্তি সব জীবের উদ্ভব ঘটায় – মৃত অতিত। ডীএনএ ক্রমানুসার বিশ্লেষণ এই ধারণার মধ্যে খাপ খায় না। কাজেই এসব উধাহরন বা সাক্ষ্য প্রমাণ এর ব্যাপার নয়, এসব হচ্ছে ধৃষ্টতা বা কাপট্য ধারনা।

বেহে আরও লিখেন, যদি আমরা কখনও এর মীমাংসায় আসি, তাহলে মানব উদ্ভব প্রশ্নের উত্তরের অন্বেষণ সেইখান থেকেই শুরু করতে হবে যেখান থেকে এটা উদ্ভব হয়েছে।

ফিলিপ জনসন এর বই এ ২৭ পাতার একটি যুক্তি অকাট্য – যারা নিজেরাই (ডারউইনবাদীরা) জোর দেয় বিজ্ঞান এবং ধর্মকে আলাদা অবস্থানে দেখতে তারাই উৎসাহের সঙ্গে তাদের বিজ্ঞানকে ধর্মের ব্যাপারে দৃঢ়চিত্তে ব্যাবহার করছে। ডারউইনবাদী লেখালেখি অধর্ম বা ধর্মবিরুদ্ধ উপসংহারপুর্ণ, যেমন - এই বিশ্ব ভ্রমান্ড কোন পরিকল্পনার ছকে আসে নাই এবং এর পেছনে কোন উদ্দেশ্য নেই, আর আমরা মানবসকল অন্ধ প্রাকৃতিক ছলনা বা প্রক্রিয়ার ফসল যেখানে আমাদের জন্য কোন ভাবনা নেই। ব্যক্তি মত হিশেবে এইসব বিবরন আসে নাই বরং বিবর্তন বিজ্ঞানের যৌক্তিক অর্থপ্রকাশের ভিত্তি হিসেবেই এসেছে। রিচার্ড ডকিন্স, অক্সফোর্ডের এক প্রাণীবিজ্ঞানী তার ১৯৮৬'র বই দি ব্লাইন্ড ওয়াচমেকার এ লেখেন – ডারউইন বুদ্ধিবৃত্তিক এবং একজন সম্পুর্ণ নাস্তিক হওয়াকে সম্ভব করেছেন।

অন্য যে বিষয়টি বিবর্তন বিজ্ঞানকে বিরাট করে ধর্মের মত স্থাপন করে সেটা হোল ডারউইন বাদীরা যে উদ্দীপনায় পৃথিবীতে তাদের সুসমাচার প্রচারের সাক্ষী রাখছে। জোর দাবিতে তারা বলছে এমনকি অবিজ্ঞানীরাও তাদের তত্বের সত্যকে গ্রহন করছে নৈতিক দায়ীত্ব হিশেবে। রিচার্ড ডকিন্স-, যিনি বিবর্তন বিজ্ঞানের বেশ প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব, অকুণ্ঠচিত্তে যিনি ডারউইন বাদের ধর্মের দিকটায় উচ্চকণ্ঠ।")

ইসলাম ন্যায়, সাম্য, যুক্তি ও জ্ঞানের প্রসারের আহ্বান জানায়। সমাজে জ্ঞান ও বিচক্ষণতার আহ্বান থেকেই ইসলামের শুরু – "পড় তোমার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানবকে জননকোষ থেকে" (কূর'আন ৯৬, ১-২)। মানবের ভ্রুণ থেকে বিবর্তনের উল্লেখ রয়েছে এর মধ্যে যা স্ত্রীর গর্ভে বিকশিত হয়। আর এইভাবে মানবের জিবতাত্বিক উৎস বা প্রারম্ভের প্রমাণ আসে যার সাথে আছে এর প্রজ্ঞা এবং আধ্যাত্মিক শক্তির সম্ভাব্যতা আর যা পরিষ্কারভাবে নির্দেশ করে একজন স্বচেতন রুপকারের (সৃষ্টিকর্তার) অস্তিত্ব এবং তাঁর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য- এই সৃষ্টির সন্মন্ধে।

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা, উদ্ধৃতি এসবকে সাধারণ ভাষায় রূপান্তর সহজ নয়, আমার জন্য তা ছিল আরও কঠিন। অনেক ক্ষেত্রে অনুবাদের পাশাপাশি মুল ইংরেজি শব্দ বা উদ্ধৃতিটি হুবহু তুলে দেয়া হয়েছে, যাতে পাঠক সুবিধামত বিষয়টির উপর আরো অনুশীলন করতে পারেন।

ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা তারই প্রতি যিনি আমাকে তৈরী করেছেন এবং এই প্রচেষ্টায় উজ্জীবিত করেছেন - আল্লাহ রাব্বুল আল আমীন (আল্লাহ অধিকর্তা বিশ্ব ভ্রমান্ডের) এঁর সন্তুষ্টির জন্যই এই বই। এর প্রচারে ও প্রসারে সবার সহযোগিতা কাম্য।

আহ্বান জানাও তোমার প্রভুর দিকে বিজ্ঞতা এবং পরিশুদ্ধ প্রচারণার বা বিশ্লেষণের মাধ্যমে এবং যুক্তি তর্ক কর যাহা উত্তম এবং অমায়িক। Q 16:125
'Invite to the Way of thy Lord with wisdom and with beautiful preaching, and argue with them in ways that are best and most gracious'

আল্লাহ্‌র নবীর কথায় - যে কেহ যারা বিজ্ঞতার বিচারে প্রচেষ্টা (ইজতেহাত) চালায় এবং কৃতকার্য্য হয় (সত্য অনুসন্ধানের সফলতায়) তাদের জন্য রয়েছে দুই দুইটি পুরস্কার, আর যারা প্রচেষ্টা চালায় কিন্তু কৃতকার্য হয় না তাদের জন্য রয়েছে একটি পুরস্কার (চেষ্টা করার জন্য)। আজ, যেকোন সময়ের চেয়ে, মুসলমান সমাজের সেই আত্মার উদ্ধারে সচেষ্ট হওয়ার প্রয়োজন বেশী।

আর এই সংযোগে বিজ্ঞান কি এবং দর্শন এর সঙ্গে এর কি সম্পর্ক এ নিয়ে মুল (ফান্ডামেন্টাল) কিছু কথা উদ্ধৃত করতে চাই বিশেষ করে যুবক যুবতীদের উজ্জ্বল মনের চঞ্চলতার কথা ভেবে।

অতিতে ইসলাম এটা অধিষ্টিত করতে সম্পুর্ণরুপে সক্ষম হয়ছে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে তার আপন বিশ্ব দর্শনে উপস্থাপিত করতে এবং বিভিন্ন গুরুত্বপুর্ন বিষয় এবং ক্ষেত্রে আপন অবদান রাখতে সমর্থ হয়েছে। দার্শনিকগন - আল কান্দি থেকে ইবন রুশদ সবাই গ্রীক দর্শনকে (হেলেনষ্টিক) সম্পুর্নরুপে আত্মস্থ্য করতে পেরেছেন; বৈজ্ঞানিক গন যেমন ইবন আল-হাইথাম, আল-বীরুনি থেকে আল-টুসি এবং ইবন আল-শাতির পর্যুন্ত সবাই বেবীলন এবং গ্রিক বিজ্ঞানের সাথে একই কাজ করেছেন বিশেষ করে জুতির্বিদ্যায় এবং একইভাবে চিকিৎসা শ্বাস্ত্রে, ইবন সিনা (৯৮০ - ১০৩৭) থেকে ইবন আল-নাফিস (১২১৩ - ৮৮) সবাই অবদান রেখেছেন।

সাধারনভাবে বলতে গেলে, আমাদের সমাজে কদর নেই বিজ্ঞানিরা যুক্তিশাসন বা বিচারবুদ্ধির যে অনুশীলন করছেন বা সমালোচনামূলক চিন্তার প্রশিক্ষনে বা যুক্তিবিদ্যার উন্নয়নে যে অবদান রাখার চেষ্টা করছেন।

বিজ্ঞান কি? এটা কিভাবে কাজ করে? বিজ্ঞান হোল যা বৈজ্ঞানিকরা করে। বৈজ্ঞানিক কি? বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া কি বা এর মুল বৈশিষ্ট কি? ভিত্তিমুলের এই সব ধারণার উন্মোচন সহজ নয় এবং এই পরিসরে সম্ভবও নয়। তবে সাধারণভাবে কিছু এর বৈশিষ্ট উল্লেখ করব (বিশেষ করে নিদাল গুশুম, Nidhal Guessoum এর বই ইসলাম'স কুয়ান্টাম কুশ্চেন, Islam's Quantum Question- Reconciling Muslim Tradition and Modern Science (2011) থেকে উদ্ধৃত করে - প্রফেসর, ফিজিক্স এন্ড এস্ট্রোনমি আমেরিকান ইউনিভার্সিটি অফ শারজাহ, সংযুক্ত আরব আমিরাত) এজন্য যে যাতে পুরো বইএ যেভাবে যুক্তি তর্ক গুলো উপস্থাপন করা হয়েছে সেগুলোর পরিধি পরিমাপ পদ্ধতি সহজ হয়ঃ

সামির ওকাশা তার বিজ্ঞানের দর্শন গ্রন্থে লিখেছেনঃ অবশ্যই বিজ্ঞান হোল এই পৃথিবী যেখানে আমরা বাস করি তাকে বুঝা,ব্যাখ্যা এবং পুর্বাভাস দেয়ার প্রক্রিয়া। আমাদের সাবধান থাকতে হবে সব ধরনের প্রকৃতির উপর অনুসন্ধান, এবং প্রতিটি সফল উদ্ভাবন বা আবিস্কার বিজ্ঞান নয়। বিজ্ঞান হোল নিয়মানুগ, অভীষ্ট লক্ষ সম্পন্ন, পরিমাপ যোগ্য, সত্য মিথ্যা প্রমান সম্পন্ন এরকম সবকিছু মিলিয়ে একটি প্রণালী যার ভিত্তিতে প্রকৃতিকে অধ্যয়ন করা যায়। এইসব করতে গিয়ে মানুষের নিজস্ব বৈষয়িক ব্যাপারগুলো অনেক সময় প্রভাবিত হয়ে যায় যা মানুষের চোখে ধরা পড়ে না, কিন্তু তা থেকেই যায়। অনেক সময় দেখা যায় যা সে দেখতে চায় সেটাই সে দেখে এবং প্রকৃত ফলাফল অভীষ্ট না হওয়ায় অজানতেই সেই দিকে অন্ধ থেকে যায়। ইবন রুশদ এর 'ফাসল আল-মাকাল' থেকে এনিয়ে বর্ননাটা এরকমঃ 'Divine Law combines Revelation whith Reason. It is to be understood on the basis of causes, means and goals. The Revelation is completed by the element of Reason, and Reason is completed by the element of Revelation'. নিদাল গুশেম এটাকে ব্যাখ্যা দিয়েছেন - 'Indeed, Ibn Rushd starts his discourse by emphasizing the importance of Philosophy as a way to reach divine truths and shows by logical steps that it must then not only be an exercise that is fully allowed for Muslims to practice but in fact it must be an obligation upon at least an elite group, for God has called upon humans to seek truths using the mind and the senses'.

স্যার কার্ল পপার যা উপস্থাপিত করেছেন যাকে বলা হয় কোন বৈজ্ঞানিক অনুমান (হাইপথিসিস) সঠিকভাবে বর্ণনা করার মুল বৈশিষ্টসম্পন্ন, বিজ্ঞান এবং অবিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য। সাধারণভাবে উল্লেখ করলে,পপার জোর দিয়েছেন যে কোন অনুমানকে বৈজ্ঞানিক হতে গেলে, অবশ্যই তা সত্য বা মিথ্যার বিচারে উত্তীর্ন হতে হবে, তার মানে এর ফলাফল অবশ্যই পরিস্কার হতে হবে বা এটা থেকে অনুমিত বিষয়টি যাচাই এর মধ্যে দিয়ে প্রমানিত হবে হয় সত্য অথবা অসত্য। যে কোন অনুমান যদি পরীক্ষা করা না যায় বা অপ্রমাণ করা না যায় তা কখনোই বিজ্ঞান হতে পারে না।

নিউটন এর মাধ্যাকর্ষন এর তত্ত্ব একটি দৃষ্টান্ত (প্যারাডাইম) ; যা পরবর্তিতে প্রতিস্থাপিত (বদলে যায়) হয় আইনস্টেইনের আরও বিশাল তত্ত্ব দিয়ে। আমরা আমাদের বিশ্বাস (ঈমান) এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্টির বিশালতা গুলোকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় বা বৈশিষ্টে সবসময় নিরীক্ষিত করা থেকে বিরত থাকব। মুসার লাঠির সাপ হয়ে যাওয়া, লোহিত সাগরের পানি সরে গিয়ে মুসার বেচে যাওয়া বা ফিরাউন এর ধ্বংস হওয়া, নুহ এর মহাপ্লাবন, ঈসা'র অন্ধকে দৃষ্টি দেয়া বা কুষ্ঠ ব্যধি থেকে নিরাময় দেয়া এসব কিছুকে বিজ্ঞানের আলোকে নিরীক্ষন করতে গেলে আমাদের বিশ্বাসের মুল যায়গাটাই গুড়িয়ে যাবে। আমরা, ইহুদী, খৃষ্টান বা মুসলমান আর থাকব না। আল্লাহ সুবহানাওয়াতায়ালার বহু সৃষ্টিকে মানুষ সীমিত বুদ্ধি বা যাচাই এর ক্ষমতায় বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়েছেন এবং হচ্ছেন। এখনও অনেককিছুই মানুষের অজানা রয়ে গেছে। ভ্রুণতত্ব নিয়ে কুর'আনের বিবরণ (কুর'আন ২৩-১৪), মহাকাশ এর বিস্তার আর পর্বতের কারন (কুর'আন ৭৮-৬,৮), মিঠা পানি আর লবণ পানির স্রোতের বিবরণ (কুর'আন ২৫-৫৩) ৭ম শতাব্দিতে মানুষ যেভাবে আত্মস্থ করেছে বিংশ শতাব্দিতে তার ব্যাখ্যার পরিধি সুপরিসর ভাবে বৈজ্ঞানিক (তবুও সবটাই বিজ্ঞান বলা যাবে না)। কুর'আনের বিবরণকে বিভিন্ন পরতে (লেয়ার) বিভিন্ন যুগে মানুষ আত্মস্থ করেছে সময় এবং জ্ঞানের পরিধিতে এবং সঠিকভাবে। প্রফেসর কীথ মূর (কানাডার টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয় এনাটমির প্রফেসর), ডঃ মরিস বুকালি(ফরাসি চিকিৎসক) এবং আরো অনেকে বিভিন্নভাবে এসবের বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। বুকালি যেভাবে বলেছেন যে ১৪ শত বছর আগে কোন মানুষের কাছেই এইধরনের জ্ঞানের সম্ভাবতা ছিল না -এর থেকে ধরে নিতে হবে কুর'আন ঐশ্বরিক বাণী। মহাজগতের অনেককিছুই মানুষের নাগালের বাইরে। মহাকাশে গ্রহ নক্ষত্র কেনই বা এক মহাগতিতে নিজস্ব কক্ষপথে, আজকের মানুষের হিসেবে, প্রায় কয়েক বা শত শত বিলিয়ন বছর ধরে

ঘুরেই চলেছে কোন রকম সঙ্ঘর্ষ বা আছড়ে পড়া ছাড়াই? (এই প্রশ্ন ষ্টিফেন হকিন তার বিখ্যাত বই এ ব্রিফ হিসটরি অফ টাইম এও রেখেছেন) কেনই বা আবহাওয়া মন্ডলে এতরকম রাসায়নিক পদার্থ (অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, হিলিয়াম, কার্বন ডাই অক্সাইড ইত্যাদি) প্রতিনিয়ত আবর্তিত হচ্ছে যার যে কোন একটির স্বল্পতায় বা আরও প্রসারে আমাদের, এই বিশ্বব্রমান্ডের অস্তিত্তের ব্যাপারেই মহা সঙ্কা জেগে উঠবে। এই গতি, এই নিয়ম এবং এই বিন্যাস বা সামঞ্জস্যতার পরিধি মানুষ অনেকটা বিশ্লেষণ করতে শিখেছে সময়ের এবং জ্ঞানের পরিধিতে। তবে এক মহাশক্তির অস্তিত্তকে উড়িয়ে দেবার মত কিছু প্যারাডাইম কেউ কেউ তৈরী করলেও সেটা সত্য অসত্যের যাচাই এ টিকছে না।

আমরা আমাদের বিশ্বাসের তাগিদেই জ্ঞানের আহরণ করব আর সেই ইতিহাস আমাদের পুর্ব বিশ্বাসীরা একেবারে শুরুতেই (যখন পশ্চিমারা তখনো ব্যস্ত অন্য কিছুতে) তার উদাহরণ রেখেছেন। ঈবন রুশদ, আল কান্দি, ফারাবি, ইমাম গাজ্জালি এদের কথা এই আলোচনার শুরুতেই করেছি। তবে বিজ্ঞানের আলোচনা বিজ্ঞান ভিত্তিক হতে হবে এটা অবশ্যই কাম্য।

আপনাদের যে কোন মতামত কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহিত হবে।

mhaque18@gmail.com

মুহাম্মদ মোস্তাগাউসুল হোক মুকুল
জেদ্দা
২৭ মে ২০১৫

পাঠকদের জন্য

লেখকের সমস্ত বই এ ধর্ম বা বিশ্বাসের বিষয়গুলো শুধুমাত্র কুর'আনের আয়াতের আলোকে বিশ্লেষিত হয়েছে আর মানুষকে আহবান করা হচ্ছে আল্লাহ্‌র বানী সমুহকে জানার জন্য আর সেই মোতাবেক জীবন নির্বাহের জন্য। সমস্ত বিষয়ে যেখানে আল্লাহ্‌র বাণী উল্লেখিত হয়েছে তা এমনভাবে বর্ননা করা হয়েছে যাতে পাঠকের মনে এ নিয়ে কোন অস্পষ্টতা, সন্দেহ বা কোন জিজ্ঞাসা না থাকে। আন্তরিক, সাধারন এবং সাবলীল রীতিতে লেখা নিশ্চিত করে যে প্রত্যেকে যে কোন বয়সের, যে কোন সামাজিক অবস্থানের সহজেই বইগুলি বুঝতে পারে। নির্মল এবং কার্যকর বর্ননা এক বারেই পড়ে ফেলা সম্ভব করে তোলে। এমনকি যারা দৃঢ়ভাবে আধ্যাত্মিকতার বিরুদ্ধবাদী তারাও প্রভাবিত হয়ে যায় যেভাবে প্রকৃত সত্য গুলোকে এইসব বই এ বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয় এবং এইসব সত্য বিষয়কে আর খণ্ডন করতে পারে না।

হারুণ ইয়াহিয়া কতৃক লিখিত এই বই অথবা অন্য যে কোন বই এককভাবে পড়া যেতে পারে আবার কোন গ্রুপ ভিত্তিক আলোচনার জন্য পড়া যেতে পারে। যে সব পাঠক যারা এর থেকে উপকৃত হতে আগ্রহী তারা এর বিবরণকে খুবই কার্যকর এবং ব্যবহারিক হিশেবে পাবে আর যার মাধ্যমে তারা তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা এবং অনুচিন্তা আর একজনের সঙ্গে সহজেই ভাগাভাগি করতে পারবে।

সর্বপরি আমাদের ধর্মের জন্যও বিশেষ অবদান রাখবে এই বই এর প্রচার এবং প্রসারণে সাহায্য করার জন্য, যা কেবল আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্যই লেখা হয়েছে। লেখকের প্রমাণাদিগুলি জোরালোভাবে বিশ্বাস উপস্থাপন করে, সুতরাং যারা ধর্ম প্রসারের জন্য কাজ করতে চায়, তাদের জন্য অনেক কার্যকর উপায়ের মধ্যে একটি হোল এইসব বই পড়ার জন্য তাদের অনুপ্রাণিত করা।

এইসব বইয়ের মধ্যে তারা লেখকের নিজস্ব বা ব্যক্তিগত কোন মতামত পাবে না, সন্দেহজনক কোন উৎস থেকে বিশ্লেষণও পাবে না, ধার্মিক বা পবিত্র বিষয়গুলোর প্রতি অসন্মান বা অগ্রহণযোগ্য কোন রীতিও নেই, অথবা নেই আশাহীন, সন্দেহ উদ্রেকময় হতাশাজনক বিবরন যা মনের মধ্যে তৈরী করে বৈরীতা বা বিভাজন।

ডারউইনবাদ ধর্ম

আদ্যিকালের এক পৌত্তলিক মতবাদ আজ অবধি বিরাজমান।

হারুন ইয়াহিয়া

ভাষান্তর মুহাম্মদ মোস্তাগাউসুল হক মুকুল

২৬ জানুয়ারী ২০১৪

সুচীপত্র

ভূমিকা ৯

ডারউইনিবাদঃ কুসস্কারের এক ধর্ম ১১

ডারউইনবাদ ধর্মের উৎপত্তি ১৮

ডারউইনবাদি ধর্মকে আরো কাছে থেকে পর্যবেক্ষন ৩৬

সংক্ষিপ্তসার ৫৭

সকল রেফারেন্স ৫৯

টিকা ৬১

ভুমিকা

إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمۡ فِيهِ وَبَٰطِلٞ مَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ (١٣٩)

এরা যে কাজে নিয়োজিত রয়েছে (জীবন প্রণালী) তা ধ্বংস হবে এবং যা কিছু তারা করেছে তা যে ভুল (মুল্যহীন)!

(সুরা আল-আরাফ, ৭-১৩৯

কল্পনা করুন একটি ধর্ম যার প্রতিষ্ঠাতা নিজেকে একজন বিজ্ঞানী হিশেবে দাবি করেন, এর পবিত্র গ্রন্থ যাতে সন্নিবেশিত হয়েছে সুবিন্যস্ত এবং সুসৃঙ্খলভাবে অনেক বিশ্লেষণ এবং যা বিজ্ঞানভিত্তিক হিশেবে অনুমান করা হয়। আর এর অনুসারী ভক্তরা যারা নিজেদের প্রজ্ঞাসম্পন্ন মনে করে। এই ধর্ম প্রায় সব সভ্যতায় অনুপ্রবেশ করেছে, সব ধী গোষ্ঠী ও সব ভাবাদর্শের মধ্যে; এর অনুসারীদের সংখ্যা শত কোটি। যে কোন ধরনের বিশেষায়িত জ্ঞানের পরিধিতে – ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, দর্শন, মনোবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান এবং আরো – এটা হোল মুল মতবাদ, 'আলো যা সত্যকে উদ্ভাসিত করে' (light that illuminates truth).

আসলে, আপনারা সবাই পরিচিত উপরে আলোচিত এই ধর্ম সন্মন্ধে। প্রতিদিনের জিবনাভ্যাসে আপনি এর মুখোমুখি হন, এর প্রচার খবরের কাগজে পড়েন আর এর প্রভাব টেলিভিশনে দেখেন। এই ধর্ম পদে পদে আপনার প্রাত্যহিক জীবনে অনুপ্রবেশ করে; আর এইভাবেই এটা হয়ে উঠেছে জীবনের অনুষঙ্গ। সম্ভবত আপনাদের মধ্যে অনেকে, জ্ঞাতসারে বা অন্যথায়, এর সরাসরি প্রভাবের শিকার হয়েছেন। আর এটা হোল ডারউইনবাদ ধর্ম (religion of Darwinism).

আবার এটাও মনে করতে পারেন, '*ডারউইনবাদ কোন ধর্ম নয়, এটা হোল বৈজ্ঞানিক তত্ব!*' কিন্তু এই পৃথিবীতে বহু লোক আছে যারা এই তত্বে উৎসর্গিত। অনেকেই বিশ্বাস করেন বিবর্তনবাদ বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমানিত বিষয় আর দুনিয়ায় এই তথাকথিত বৈজ্ঞানিক অবস্থানের বিস্তার বেশ প্রসারিত।

এই মতবাদের ভীত ভুলের সুত্রে গাঁথা মালার উপর প্রতিষ্ঠিত। আর আমাদের এই বই লেখার উদ্দেশ্যই হোল সেইসব ভুলে গাঁথা মালার একটি একটি জোড়া উম্মোচিত করা তাদের সামনে যারা এর প্রভাবের শিকার হয়েছেন। তাদেরকে দেখিয়ে দেয়া যে বিজ্ঞানের ছদ্মরূপে, দৃষ্টবাদ মোহ অথবা বিভ্রমের বেশী কিছু নয়। বিবর্তনের তত্ব, এর শাস্ত্র, এর অনুরাগী, এর কথিত জবাব এবং বিশ্লেষণ জীবনের শুরু আর উৎপত্তির উৎস, এর উপাস্য এবং বিশ্বাস, এর সমালোচনা ও বৈজ্ঞানিক প্রবৃদ্ধির প্রতি বদ্ধ মুল চিন্তা সবই হোল অ- ইব্রাহীমের ধর্ম (ইহুদি, খৃষ্টান বা মুসলমান বহির্ভুত) যা সৃষ্টিকর্তা বা আল্লাহ'র অস্তিত্তকে অস্বীকার করে।

এটা সত্য যে ডারউইনবাদ প্রতিষ্ঠাই হয়েছে আল্লাহ'র অস্তিত্তের অস্বীকারের উপর ভিত্তি করে, আর আসলে এটা এমন এক নিকৃষ্ট ধর্ম (pagan) যা বহু লোক - এমনকি এর অনেক অনুসারী- সম্প্রতি খোলাখুলিভাবে বিভিন্ন প্রবন্ধে, বই এবং এইধরনের লেখালেখির মাধ্যমে উল্লেখ করতে শুরু করেছে; অতএব, আপনি সম্ভবত এই বই পড়ে বিস্মিত হয়ে যেতে পারেন। আর আপনি যখন উপলব্ধি করবেন কিরকম কুট কাটিল্যের বিশাল বিস্তৃতি এই ধর্মের মধ্যে তখন নিজেকে জিজ্ঞাসা করবেন কেন আমি অনেক আগেই এই সত্যকে উপলব্ধি করতে পারি নাই।

ডারউইনবাদ এক ভ্রান্ত ধর্ম; এরপরও, এটা বৃহত্তর এবং বিশালভাবে বিস্তারিত এক ধর্ম এই পৃথিবীতে। বিভিন্ন ধরনের প্রচারণার শক্ত প্রভাবে মানুষের উপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে, যার মুলেই রয়েছে বিভ্রান্তি এবং অসত্যভাষন। বিভিন্ন প্রজন্মে এর অনুসারীদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধিই পাচ্ছে। অস্বচেতনভাবে, মানুষ এই ভ্রান্ত ধর্মের মাধ্যমে প্রভাবান্বিত হচ্ছে এবং সময়ের ব্যবধানে হতে পারে কঠিন ডারউইনবাদী।

কিন্তু সত্য ক্রমাগতভাবে উন্মোচিত হচ্ছে বিজ্ঞানের এই যুগে যা এই সৃষ্টিকর্তা বিহীন ধর্ম সহ্য করতে পারছে না। প্রতিটি নুতন উদ্ঘাটনের মাধ্যমে মানুষ আবারও সত্যিকারের সৃষ্টির মুখোমুখি অবস্থান নিচ্ছে। ডারউইনবাদ ধর্মের শক্তি অবক্ষয় হচ্ছে সৃষ্টির প্রথম আবির্ভাবের প্রশ্নের সামনা সামনি করতে গিয়ে, জীবের নিখুত পরিকল্পনায় এর অতি জটিল কাঠামোয় এবং এদের প্রজাতিগত বিভিন্নতায় এরকম আরো প্রশ্নের আঘাতে। প্রতিদিনই একটা একটা করে জীবন কাঠি হারাচ্ছে, কেননা এই ধর্ম অন্ধ বিশ্বাসের উপর স্থাপিত আর জৈবানূবিজ্ঞান, প্রজননশাস্ত্র, জীবাশ্ম বিজ্ঞান এবং জৈবগণিত এসবের আবিষ্কারের সামনে থাকছে অক্ষম ও অসহায়। বিজ্ঞানের এই সব পরিশাখায় নিত্য নতুন আবিস্কার অতিপরিস্কার এবং সুস্পষ্টভাবে প্রমান করছে বিবর্তনবাদ সঠিক বা সত্য নয়।

আর একমাত্র সত্য জিনিসগুলো বার বার বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার মাধ্যমে সৃষ্টির গুড় তত্বকে আরো উদ্ভাসিত করছে। এমন কি খালি চোখেই যদি আশেপাশের জীবন্ত জিনিষগুলো অবলোকন করা যায় তাহলে দেখা যাবে এক অসাধারন বুদ্ধিমত্তা, কৌশল আর নকসা। যদি অণুবীক্ষণ যন্ত্রে কোন সামুদ্রিক অনু কণা সমান জীব, একটি একক কণা, একটি কোষ অথবা কোন জীবন্ত অবয়ব নিরীক্ষণ করা যায় তাহলে দেখা যাবে স্তম্ভিতকারী গঠন বা সংজোযন। আর এই বিশাল বুদ্ধিমত্তা, নিখুত পরিকল্পনা এবং সম্পুর্ন নির্ভুল নকসা প্রকৃতির পরতে পরতে যা কেবল এসেছে আল্লাহর কাছ থেকে, তিনিই হচ্ছেন সব শক্তি এবং সামর্থের আঁধার।

১ অধ্যায়

ডারউইনবাদঃ

কুসংস্কারের ধর্ম

পরিবর্তিত ,কিন্তু চারিত্রিকভাবে একই ডারউইন তত্ব ,আর এর অনুসারিরা এটাকে এক গোঁড়া মতবাদ হিশেবে প্রচার করছে ধর্মিয় আবগের সাথে ,আর তারা মনে করে ,অল্প কিছু লোক যারা একে সন্দেহ করে তারা মুলত বিশৃঙ্খল কাদা ছোড়াছুড়ি কারী, বিজ্ঞানের অনুপযুক্ত। (Marjorie Grene, *Encounter*, November 1959, p.48)

সূচনায় যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, বিবর্তন বাদের তত্বকে বিজ্ঞানীদের পরিধিতেই অবমুল্যায়ন করা হয়েছে। যখন থেকে এই তত্বের উদ্ভাবন তখন থেকেই অনেক বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন একে একে এর দাবি গুলোকে বাতিল করেছে । পরমাণু অণুবীক্ষণ (electron microscope) যন্ত্রের উদ্ভাবন, সৃষ্টি-সম্পর্কিত নিয়মের নুতন জ্ঞান, ডিএনএ (Deoxyribonucleic acid – একটা অনূ যা জীবন্ত জীব এবং ভাইরাসের উৎপত্তি (সৃষ্টি) সন্মন্ধিয় কাঠামোর ভিত্তি, এর গঠন এবং ক্রিয়াকর্মের পরিক্রমকে সঙ্কেতাক্ষরে (encode) উদ্ভাবন করে) কাঠামোর উদ্ভাবন, প্রতিটি জীবের গঠন রহস্যের জটিলতার উন্মোচন, এভাবে আধুনিক অগ্রযাত্রা গুলো ডারউইনবাদকে পরাজিত করে চলেছে এবং একে অস্বীকার করতেই থাকবে। এই লেখকের অন্যান্য বইয়ে ডারউইনবাদের পতনের উপর আপনি পড়তে পারেন, বৈজ্ঞানিক সত্য এবং প্রমানের আলোকে বিবর্তনবাদের তত্বকে কিভাবে অকার্য্যকর হিশেবে পর্যুবসিত করেছে।[১]

কিন্তু বিজ্ঞানের দ্রুত ও ক্রমাগত অগ্রযাত্রা স্বত্বেও এবং প্রতিনিয়ত আমাদের জীবনে নুতন কিছুর সংযোজন করছে, কিছু অস্বচ্ছ, বিদ্বেষময় এবং রক্ষণশীল মননের বিজ্ঞানী অবিরামভাবে উনবিংশ শতাব্দির এই সব তত্বকে স্বমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। যেসব তত্ব শুরুর সেই আদিম বৈজ্ঞানিক ধারণায় বিশ্লেষন করা হয়েছে, যার অগভীরতা এবং সারল্য বাতসল্য সুলভ।

তাহলে ডারউইনবাদ এখনো কিছু বৈজ্ঞানিক বৃত্ত্যের মধ্যে জনপ্রিয় সেটার বিশ্লেষণ কি হতে পারে? এমনকি একটিও শক্ত বৈজ্ঞানিক প্রমান নাই এই জায়গায়; বরং উল্টোটা, এটা খুবই পরিস্কারভাবে সাক্ষ্য দেয় যে প্রতিটি জীবের সৃষ্টি হয়েছে এক নিখুত নকশায় বা শৈলীতে, এবং কোন কিছুই তার অস্তিত্বে দৈবক্রমে আসে নাই, যেভাবে বিবর্তনের তত্ব দাবি করে। তাহলে এটা কি করে হয়, অনেক লোক এরপরও এই তত্বের শক্ত সমর্থক হিশেবে প্রচার চালাচ্ছে?

তার কারন হোল এইঃ এই তত্ব হোল সর্বপরি কিছু মানসিক ভাবাবেগ এবং বিশ্বাসের অভিব্যক্তি বই অন্য কিছু নয় আর এর মধ্যে বৈজ্ঞানিক বুৎপত্তির কিছুই নাই। এই ভাবাবেগ বিবর্তনকে নিছক তত্ব হিশেবে দেখে না যার বৈধতা বৈজ্ঞানিকভাবে অনুসন্ধান করা যেতে পারে, কিন্তু তারা এটাকে এক বিশ্বাসের উপর রেখে যে কোন মুল্যে তা খন্ডন করতে বদ্ধ পরিকর। কারন তাদের বিশ্বাস বিজ্ঞানের সত্য দিয়ে প্রমান করা যাবে না, আর এইসব মানব যাদের চিন্তাধারার ঔদ্ধত্য তাদেরকে যেভাবে তাদের মতবাদের সঙ্গে একীভূত করে সেখানে সামান্যতম বৈজ্ঞানিক প্রমান বা যুক্তি যা এসবকে খন্ডাতে পারে তার কোন প্রভাব ফেলতে পারে না। বিবর্তনের বিপক্ষে যত অকাট্য প্রমান বা যুক্তিই থাকুক না কেন, বিবর্তনবাদীরা তা উপেক্ষা করেই যাবে এবং তাদের বিশ্বাসকে জোরালোভাবে প্রতিরক্ষা দেবে।

ডারউইনবাদীদের জন্য বিবর্তনের তত্ব বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবনার থেকেও আরো কিছু। আর এই মতবাদ যখনই আলোচনার জন্য উত্থাপিত হয়, বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানীরা চটজলদি তাদের পক্ষপাত শুন্যতা থেকে মোড় নেয় এবং তাদের বৈজ্ঞানিক বস্তুনিষ্ঠতা হারিয়ে ফেলে। তারা এতই ভয়ঙ্করভাবে এই তত্বের সঙ্গে একীভূত যে এমনকি বিরাট বিশিষ্ট জীববিজ্ঞানীও "বরং তাঁর ডান হাত হারাবে কিন্তু এইটুকু বলতে রাজী হবে না যে, 'যদি বিবর্তনবাদের তত্ব সঠিক হয় ....."[২] তারা এমনকি এইটুকুও মানতে নারাজ যে বিবর্তনবাদ হয়তবা সত্য নয়।

বিজ্ঞানীদের মধ্যে এরকম ভাবাবেগ মানুষের কাছে ব্যতিক্রম। তারা সাধারণভাবে মনে করে বৈজ্ঞানিক মতামত কোন বিজ্ঞানীর নিজস্ব দার্শনিক বা নৈতিক পক্ষপাত থেকে সম্পুর্ন স্বাধীন আর বিজ্ঞানীরা হোল বস্তুনিষ্ঠ ব্যক্তিত্য যারা কোন তথ্যকে বাস্তব এবং নির্দিষ্ট উপাত্ত দিয়ে হাজির ও প্রমান করে আর অনুসন্ধান বা গবেষণা দিয়ে তা প্রতিষ্ঠা করে। আর এইজন্যই তারা বিবর্তনের মতবাদের সঠিকতাকে ক্বচিৎ সন্দেহ করে।

আর এইখানেই হোল মুল এবং বিশাল গলদটা, যাইহোক, এইকারনেই বিবর্তনবাদী 'বিজ্ঞানীরা' যখন বিবর্তনের তত্ব নিয়ে আলোচনা করে, বৈজ্ঞানিক মানদণ্ড তখন তারা নিয়ে আসে না। বিখ্যাত ডারউইনবাদী, পিয়েরে টিলহার্ড ডি চার্ডিন (Pierre Teilhard de Chardin) ডারউইনবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গিতে *'বিজ্ঞানের'* অবস্থানকে এখানে উন্মোচন করেছেনঃ

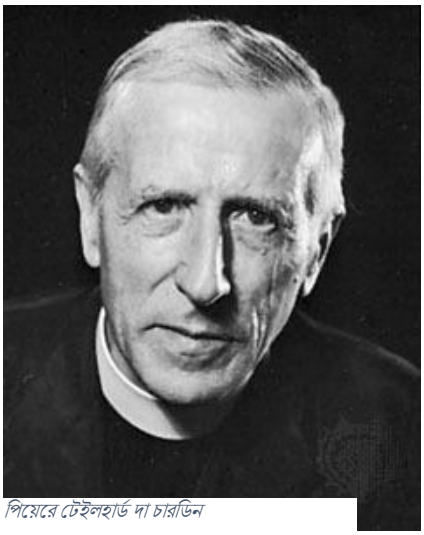
পিয়েরে টেইলহার্ড দা চারডিন

বিবর্তনবাদ একটি তত্ব, একটি পদ্ধতি না একটি অনুমান? এটা এসবের থেকে অনেক কিছু। এটা হোল একটি মৌলিক নীতি যা সব তত্ব, সব অনুমান, সব পদ্ধতি এখন থেকে অবশ্যই এটাকে শিরধার্য্য করবে, একে অবশ্যই সত্য এবং সম্ভব হিশেবে মেনে নেবে। বিবর্তন হচ্ছে এক আলো যা আলোকিত করে সব তথ্য, আবক্রপথ যা সব রেখা অনুসরণ করবে। আর এটাই হোল বিবর্তন।[৩] উপরের উদ্ধৃতিতে আমরা দেখতে পাই, কি রকম প্রকাশভঙ্গি ডারউইনবাদীরা ব্যবহার করে যখন তারা তাদের তত্ব নিয়ে কথা বলে, এখানে তাদের উদ্ধত মনোভাব এবং অন্ধ আনুগত্যের মুল সুত্রটি পাওয়া যায়। আরো উদাহরণ নেয়া যাক, পৃথিবীতে আর একজন বিখ্যাত বিবর্তনবাদী, জী, ডাব্লিউ, হারপার - G. W. Harper, বিবর্তনবাদের তত্বকে বলেছেন একটি অধ্যাত্নিক বিশ্বাস [৪] (metaphysical belief), হার্ভার্ডের বিখ্যাত বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানী আর্নষ্ট মেয়র - Ernst Mayr এটাকে বলেন " বিশ্বজনীন মানুষের আজকের ভাবনা" —man's world view today। [৫]

যখন ডারউইনের তত্ব উপস্থাপিত করা হয়েছিল তখন বিজ্ঞানের সময়কালটা ছিল গোড়ার স্তরের। তখনকার সময়ের বিজ্ঞানীরা খুবই সাধারণ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতেন, আর এখন কম্পিউটার এবং পরমাণু অনুবেক্ষন যন্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে। এইসব যন্ত্রের উদ্ভাবন যেমন অনুবেক্ষন যন্ত্র থেকে অন্যসব কারিগরি সরঞ্জাম বা হাতিয়ার, শুরু হয়েছে মাত্র বিংশ শতাব্দীতে। বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা ডারউইনের সব সেকেলে বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞানের স্তর অতিক্রম করে ক্রমান্বয়ে সেসব করছে প্রত্যাখাত।

স্যার জুলিয়ান হাক্সলি — Sir Julian Huxley, সম্ভবত বিংশ শতাব্দির খুবই নেতৃস্থানীয় বিবর্তনবাদী, যিনি বিবর্তনবাদকে দেখেছেন এভাবে যে "এটা একটি বিশ্বজনীন সর্বব্যাপি প্রক্রিয়া" (a universal and all-pervading process) আর আসলে, 'সম্পুর্ণ বাস্তব'[৬] (whole of reality) বই কিছু নয়। আজকের দিনের একজন নেতৃস্থানীয় বিবর্তনবাদী প্রজননবীদ, থীওডোসীয়াস ডবঝানস্কির (যিনি নিজে সম্ভবত ১৯৭৫ সালের দিকে যখন তাঁর মৃত্যু হয় সেই সময়টাতে বিখ্যাত বিবর্তনবাদীদের একজন হিসেবেই পরিচিত ছিলেন) জন্য শোকবানীতে বলেন যে ডবঝানস্কির বিবর্তনবাদের দৃষ্টভঙ্গি মুলত ডি চারডিনকেই অনুসরণ করে। কার্ল পপার — Karl Popper, দুনিয়ার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক দর্শনবীদের মধ্যে একজন, উল্লেখ করেছেন বিবর্তন একটি বৈজ্ঞানিক তত্ব (theory) নয়, এটা বরং অধিবিদ্যার একটি গবেষণা কার্যক্রম।[৭] আর এই বর্ণনা বা উল্লেখিত সংজ্ঞাকে অনুসরণ করে এইস, এস, লিপসন — H.S. Lipson, নিম্নোল্লিখিত সিদ্ধান্তে উপনিত হনঃ

আসলে, বিবর্তন একভাবে হয়ে গেছে বৈজ্ঞানিক ধর্ম, প্রায় সব বিজ্ঞানীরা এটাকে গ্রহন করেছে এবং অনেকে তাদের মতামতকে এর সঙ্গে উপযোগী করার জন্য 'মার প্যাঁচ' এর আশ্রয় নিতেও কুন্ঠিত ছিলেন না।[৮]

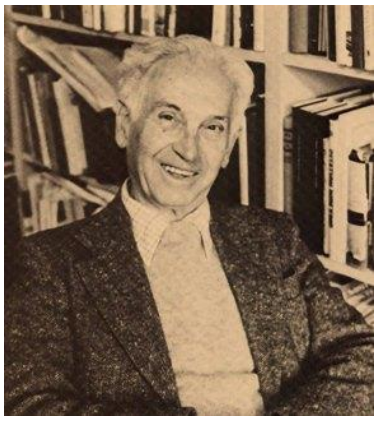

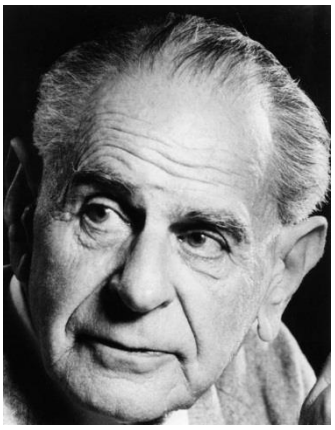

-

থীওডসীয়াস ডবঝানস্কি, আর্নষ্ট মেয়র, কার্ল পপার

যখন উপরেল্লিখিত কর্তৃত্বকারী ব্যক্তিগন ডারউইনবাদ নিয়ে আলোচনা করে, তাদের কথাবলা ও প্রকাশভঙ্গি লক্ষণীয়। তারা কখনই গাণিতিক বা বৈজ্ঞানিক তথ্য উল্লেখ করে না এমনকি কোন পরীক্ষা নিরীক্ষা বা গবেষণা প্রমান স্বরূপ সে সবের পক্ষে উপস্থাপন করে না। বরং সব অদ্ভুত বর্ননার আশ্রয় নেয়, বিবর্তনকে বলে ‘‘সম্পুর্ণ বাস্তব’ (whole of reality)’’, ‘‘এটা একটি বিশ্বজনীন সর্বব্যাপি প্রক্রিয়া’’ (a universal and all-pervading process)’’, ‘‘এক আলো যা আলোকিত করে সব সত্যকে’’।

অধিবিদ্যক ব্যাখ্যা - metaphysical interpretation অথবা অতিরঞ্জিত অনুমান– মাধ্যাকর্ষন আইন, ঘুর্নমান পৃথিবী অথবা তাপগতিবিদ্যার আইন এইসবের ব্যাপারে উল্লেখের জন্য কেহই এধরনের অনুশাসন মুলক বক্তব্য দেয় না। এইসব হোল বৈজ্ঞানিক ব্যাপার আর সহজেই মেনে নেয়ার বিষয়, এরপরও কেহই এরকম অত্যাধিক দাবি করেনা নিউটন, আইনস্টাইন অথবা অন্য কোন বিজ্ঞানীর ব্যাপারে। কেহই এরকম বলে না যে মাধ্যাকর্ষন আইন একটি ‘নিশ্চিত বিশ্বাস – convincing belief’, এবং তাপগতিবিদ্যার আইন সম্বন্ধে এরকমভাবে কেহই বলে না যে ‘‘আমি বরং আমার ডান হাত হারাবো কিন্তু এইটুকু উল্লেখ করতেও রাজী হবো না যে বাক্যের শুরুটা ‘যদি এই তত্ব সঠিক হয় ......’’

যাহাইহোক, বিবর্তনবাদীদের নিয়মটাই সম্পুর্ন ভিন্ন। তারা যেভাবে বলে, তারা শপথ করেছে তাদের ধর্মকে তারা যেকোন ভাবে সুরক্ষা দেবে এই রকম ভাবই তারা প্রকাশ করতে চায়। অতএব, তারা বৈজ্ঞানিক প্রমাণাদি বা আলোচনা অনুসরণ করে না। তারা কোন গবেষণা বা আবিষ্কার এসবের কোন উল্লেখ করে না শুধুমাত্র তাদের অধিবিদ্যার সংজ্ঞার আশ্রয় নেয়। আর এইসব কথাগুলিকে যদি শুদ্ধ বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে কৌতূহলোদ্দীপকভাবে যা বেরিয়ে আসেঃ ‘‘বিবর্তনবাদী অনুশাসন বা মতবাদ!,’’ ‘‘বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস!,’’ ‘‘একটি প্রত্যায়িত বিশ্বাস!,’’ ‘‘মানুষের আজকের ভাবনা!,’’ ‘‘প্রচারের প্রক্রিয়া!,’’ ‘‘সত্যের সবটুকু!,’’ ‘‘একটি আলো যা সব তথ্যকে আলোকিত করে!,’’ ‘‘অধিবিদ্যা বিষয়ক বিশ্বাস!,’’ ‘‘অধিবিদ্যার গবেষণা কর্মসুচী!,’’ ‘‘এক কক্ষপথ যেটাতে সব চিন্তা ভাবনার কর্মযজ্ঞ অবশ্যই অনুসরণ করবে!’’......

যদি বিবর্তনবাদের তথ্যাদি আরো নিরীক্ষা করা হয়, যে কেউ এর ধর্মীয় বিশ্বাসের ধরনের আরো অনেক উদাহরণের মোকাবিলা করবে এবং দেখতে পাবে যে সমাজের যা কিছু বা শরীরবৃত্তিয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপসর্গ সবকিছুকেই বিবর্তনের দৃষ্টিকোণ থেকেই

অবলোকন করছে। এল, সি, বার্স – L.C. Birch, একজন জীববিজ্ঞানী সিডনী বিশ্ববিদ্যালয়ের, এবং পি, আর, এহরলীক – P.R.Ehrlich, ষ্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন জীববিজ্ঞানী, বিবর্তনবাদের মতামতকে এইভাবে বর্ননা করেনঃ

আমাদের বিবর্তনের তত্ব পরিণত হয়েছে ... যা কোনই সম্ভাব্য পর্যবেক্ষন দিয়ে বাতিল বা খণ্ডন করা যাবে না। যে কোন বোধগম্য অনুমানই এর সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যাবে। আর এইজন্যই এটা ''পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের গণ্ডির বাইরে'' কিন্তু নেহাৎ ভুল বলা যাবে না। কেহই চিন্তা করে কোন রাস্তা বের করতে পারবে না এটাকে কোন পদ্ধতিতে পরীক্ষা করতে। ধারণাগুলো হয় কোন ভিত্তি ছাড়া অথবা অল্পকিছু গবেষণাগারের পরীক্ষায়, যা করা হয়েছিল অত্যন্ত সাধারণ পদ্ধতিতে এবং তা গ্রাহ্যতা পেয়েছে এর বৈধতার থেকেও অনেক বেশী। সেসব বিবর্তন মতবাদে অঙ্গিভুত হয়ে গেছে এবং আমাদের অনেকের কাছে গ্রাহ্যতা পেয়েছে আমাদের প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে।[৯]

বর্ত্তমানের বিবর্তনবাদীরা ডারউইনের থেকেও অনেক অনমনীয়।

উদ্ধত মতবাদের কারনে সমসাময়িক বিবর্তনবাদীদের এমনিই মনে হয় যে তারা ডারউইনের থেকেও অনেক অনমনীয়। ডারউইন যখন এই তত্ব উপস্থাপন করেন, তিনি এইরকম অবকাশ রেখেছিলেন যে হয়তবা তিনি ভুলও করে থাকতে পারেন। তাঁর বই – **দি অরিজিন অব স্পেসিস** এ (প্রজাতির উৎপত্তি) তিনি প্রায়ই তাঁর প্রকাশভঙ্গী বা বিবরণ শুরু করেছেন এইভাবে যে – ''যদি আমার তত্ব সঠিক হয়।'' তাঁর গবেষনায় এটা লক্ষণীয় যে ডারউইন কিছু বৈজ্ঞানিক মানদণ্ড মেনে নিয়েছেন এবং তাঁর তত্বকে নিরীক্ষণের জন্য কিছু দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ, জীবাশ্মের তথ্য সম্বন্ধে তিনি লিখেনঃ

যদি আমার তত্ব সত্য হয়, অসংখ্য মধ্যবর্তি প্রজাতি, যেগুলো খুবই নিকটবর্তিভাবে একই প্রজাতিতে অবশ্যই অস্তিত্যে ছিল... এরই ফল স্বরূপ, আদি প্রজাতির অস্তিত্যের সাক্ষী হিশেবে এদের জীবাশ্মের অবিশিষ্টের মাঝে তা পাওয়া যেতে পারে।[১০]

ডারউইন উল্লেখিত অসংখ্য অন্তর্বর্ত্তী প্রজাতির সন্ধান কখনই পাওয়া যায় নাই, আর আজ অনেক বিবর্তনবাদী জীবাস্ম বিজ্ঞানীকে এই সত্য মেনে নিতে হয়েছে। আর যখন ডারউইনের ''যদি আমার তত্ব সত্য হয়'' এই শর্তকে হিসেবের মধ্যে নেয়া হয় তখন তাঁর এই মতবাদকে অবশ্যই প্রত্যাখান করা দরকার। আর যদি সে জীবিত হোত আজ, সম্ভবত ডারউইন নিজেই শুধু এই একটি কারনে নিজের তত্বকে পরিত্যাগ করতেন ।

কিন্তু আধুনিক বিবর্তনবাদীরা বিস্ময়কর উপেক্ষা এবং অন্ধত্য প্রকাশ করে এব্যাপারে। বিলিম ভি ইউটোপিয়া'য় (বিজ্ঞান এবং কল্পলোক) তুর্কীর বিখ্যাত বিবর্তনবাদী সাময়ীকি গুলির একটি, ডক্টর উমিট সায়ীন এর একটি প্রবন্ধ প্রকাশ পায়, যিনি তুর্কিতে একজন নেতৃস্থানীয় বিবর্তনবাদের বিশেষজ্ঞ হিসেবেই স্বীকৃত। ডারউইনের অন্তর্বর্ত্তী প্রজাতির সন্মন্ধে তিনি যা বলেন, ''যদি আমার তত্ব সত্য হয়... আদি প্রজাতির অস্তিত্যের সাক্ষী হিশেবে এদের জীবাশ্মের অবশিষ্টের মাঝে তা পাওয়া যেতে পারে,'' ডক্টর সায়ীন লিখেনঃ

এটা সত্য যে আর্কিওপ্টেরিক্স – Archaeopteryx, ছিল উড়ন্ত ডাইনোসর যার সামান্যই গুরুত্ব আছে বিবর্তনের তত্বের সঠিকতা বা বৈধতার সঙ্গে। এমনকি যদি কোন পরিবর্তনকালীন সময়ের কোন জীবাশ্ম নাও পাওয়া যায়, বিবর্তনবাদের তত্ব এতে প্রভাবিত হবে না... ধরা যাক আমরা কোন জীবাশ্মই পেলাম না; এটা প্রমান করে যে সমস্ত মধ্যবর্ত্তীকালিন প্রজাতি গুলো হারিয়ে গিয়ে প্রকৃতির মধ্যেই বিলীন হয়ে গেছে। ধরা যাক প্রতিটি জীবাশ্মই একটি

ধোকা! এরপরও তা বিবর্তনের মতবাদকে প্রভাবিত করবে না, কেননা জিবাশ্মগুলি, আর্কিওপ্টেরিক্স এবং অন্যান্ন পরিবর্তনকালীন সময়ের রুপগুলির দরকার শুধুমাত্র প্রক্রিয়াটা বর্ননা করার জন্য।[১১]

অতি সাম্প্রতিক জীবাস্ম বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে আবিষ্কার তাতে এটা স্পষ্টভাবে প্রমান করে যে আর্কিওপ্টেরিক্স একটি পরিবর্তনকালীন রুপ নয় বরং এটি একটি পাখী যে প্রকৃতই উড়ত। কিন্তু, বিবর্তনবাদীরা এরপরও তাদের মতবাদ পরিহার করে নাই। তাদের নানারকম তথাকথিত প্রমানগুলি যেমন - আর্কিওপ্টেরিক্স, বিজ্ঞানের আবিষ্কারের মাধ্যমে বাতিল হয়ে যায়।

অন্যভাবে বলতে গেলে, এই লেখক বলেন ' যদি আমরা কোন জীবাশ্ম নাও পাই তবুও আমরা আমাদের বিবর্তনের বিশ্বাসকে রক্ষা করব'। যদিও স্বয়ং ডারউইনের জন্য এই বিষয়টা ছিল একটি গুরুত্বপুর্ণ মাপকাঠি তাঁর তত্বের জন্য। যেটা এই লেখক উপেক্ষা করেছেন তাঁর নিজের বিবর্তনের উপর বিশ্বাসকে সমুন্বত রাখার জন্য, আর যেটা খুবই একটা চমকপ্রদ ব্যাপার। আর এটা এই প্রমান করে যে ডারউইনবাদ একটি ঔদ্ধত বিশ্বাস যেখানে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াকে অসঙ্গত করা হয়েছে।

এক বুদ্ধিবৃত্তিক স্বেচ্ছাচারীত্ব

মিষ্ট উচ্চারণের ভাষায় বিবর্তনবাদীরা উপরে যেসব উল্লেখ করেছেন তা তাদেরকে এক বিভ্রম মায়ায় আবিষ্ট করে যেকোন ধর্মানুসারীদের অবস্থানের থেকে অনেক উপরে স্থাপিত করে রাখে। পক্ষপাতে ঘুর্ণিত তাদের চিন্তাধারায় বিবর্তন হচ্ছে একমাত্র 'অভিষ্ট সত্য', আর বিবর্তনবাদীরা এই মোহতেই উৎসাহিত হয়ে সবাইকে ডাক দিচ্ছে এই বিবর্তনবাদী চিন্তাধারায় উৎসর্গিত হওয়ার জন্য। অন্য ধর্মানুসারীরা যদি বিবর্তনবাদ এবং এর প্রস্তাবিত তত্বকে গ্রহন করে, তাদেরকে তখন 'নৈতিক মতবাদ' হিশেবে মেনে নেয়া হয়। নব ডারউইন চিন্তাধারার বিখ্যাত এক নাম হোল জর্জ গেলর্ড সিম্পসন – George Gaylord Simpson, এইভাবে বর্ননা করেনঃ

অবশ্যই কিছু বিশ্বাস চলিত আছে যেগুলোকে ধর্ম হিশেবে আখ্যা দেয়া হয় এবং ধর্মিয় ভাবাবেগে জড়িত, সেগুলো সম্পুর্নভাবে বিবর্তনবাদের সঙ্গে বেমানান আর এ জন্যই সেগুলো বুদ্ধিবৃত্তীকভাবে অগ্রাহ্য তাদের আবেগময় আবেদন সত্যেও। তথাপি, আমি এখন একে স্বতঃপ্রমান হিশেবে নিয়েছি, আর এজন্য বাড়তি আলোচনার কোন অবকাশ রাখে না যে বিবর্তনবাদ এবং সত্যিকারের ধর্মের মধ্যে কোন সঙ্গতি আছে। [১২]

এর মানে বিবর্তনবাদ এবং 'বৈজ্ঞানিক' মতবাদগুলো এখান থেকেই উন্নিত হয়েছে সেজন্যই অন্য ধর্মগুলোকে বিচার করার অধিকার রাখে। বিবর্তনবাদ তত্ব কর্তৃত্ত করে ধর্মগুলোর উপর, আর সিদ্ধান্ত দেয় কোন ধর্মগুলো এবং কি ধরনের ব্যাখ্যা সত্য হিশেবে গৃহীত হবে। আর এইধরনের পক্ষপাতমূলক চিন্তাধারার মতে ধর্ম হচ্ছে কেবলই শিক্ষার অধিকর্তা যার উদ্দেশ্য হোল মানুষের নৈতিক বিষয়গুলো নির্ধারণ করা। কর্তৃত্বকারী মনোভাব যা মানুষকে চালিত করে অন্যদের বিশ্বাসকে জোর করে প্রভাবান্বিত করার যা কুরআন এ উধাহরন সহ বর্ননা করা হয়েছে। অতি প্রাচীন মিশরীয় ফেরাউনকে এখানে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ

ফেরাউন বলল, আমি যা বুঝি, তোমাদেরকে তাই বোঝাই, আর আমি তোমাদেরকে মঙ্গলের পথই দেখাই। [১৩]

আর একইভাবে সমসাময়িক বিবর্তনবাদীদের চিন্তাধারার বৈশিষ্ট প্রকাশ পায়। তাদের অভিমুখ ফেরাউনের সঙ্গে খুবই মিলে যায়; যখন তারা তাদের বিবর্তনবাদের তত্ব মানুষের উপর আরোপিত করে, তারা বৈজ্ঞানিক বৃত্তকে রাখে নিরীক্ষের বাইরে আর বিবর্তনকে করে ফেলে পূত পবিত্র বিষয়। যারা এসবকে বিশ্বাস করে না চটজলদি তাদেরকে বাদ দেয়া হয়। বিখ্যাত শরীর বিদ্যার প্রফেসর ডক্টর থমাস ডুয়াইট – Thomas Dwight, এই অবস্থাকে বলেছেন 'বুদ্ধিবৃত্তির স্বেচ্ছাচার'[১৪]

বিবর্তনের ক্ষেত্রে এই ভাবধারার যে অতিমাত্রার অপপ্রয়োগ এটা যে কোন মাত্রায় পৌঁছেছে সেটা বাহিরের কারোর বোধগম্যের বাইরে। এটা শুধু আমাদের চিন্তাধারার পদ্ধতিতেই প্রভাব ফেলে না (আমি স্বীকার করি আমার নিজের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে), এর আগ্রাসন সন্ত্রাসী সময়গুলোর মত। কিভাবে অতি অল্প কিছু বিজ্ঞানের পুরোধারা দুঃসাহস করে সত্যের ব্যাপারে তাদের নিজস্ব চিন্তাধারা প্রকাশ করার।[১৪]

অবশ্যই, বিবর্তন মতবাদ হোল একটি কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্ম যা মানুষকে আন্দোলিত করে, তবে নিশ্চিতভাবে এটা কোন বিজ্ঞান নয়। যদি বিবর্তনবাদীরা যা কিছু বলে বা তাদের লেখায় প্রকাশ করে সেটা যদি গভীরভাবে খুটিয়ে পরীক্ষা করা হয়, তাহলে অবশ্যই আপনি পঙক্তিগুলোর মধ্যে উপলব্ধি করতে পারবেন যে তারা এক ধর্মের কথা বলছে। আর এই অবলোকন থেকে যদি দেখা হয়, তাহলে প্রখ্যাত বিজ্ঞানের ইতিহাসবীদ, মারজরী গ্রীন – Marjorie Grene, কি বলে সেটা আশ্চর্য্যবোধক মনে হবে নাঃ

এটা বৈজ্ঞানীক ধর্ম যা ডারউইনবাদীরা সস্তাভাবে ধরে নেয় এবং কিছু মানুষ তা মনেও করে। জীবনের উৎপত্তি, মানুষের বিষয়গুলো, মানুষের গভীর আশা এবং উচ্চতর সাফল্য, যা হয়েছে বহিরাগত এবং অপ্রত্যক্ষ প্রত্যয়ের সামান্য গরমিলে, প্রতীয়মান হয় যে এটাই হচ্ছে প্রাকৃতিক জগতের মুল চাবি ..... আজ এই ধারণায় অগ্নিসংযোগ হয়েছে। পরিবর্ত্তিত, কিন্তু চরিত্রগতভাবে ডারউইন'এর তত্ব পর্যবসিত হয়েছে এক গোঁড়ামি যা তাঁর অনুসারীরা প্রচার করছে এক ধর্মিয় উন্মাদনায়, আর তারা মনে করে অল্প কিছু যারা একে সন্দেহ করে তারা হোল কাদা ঘোলাকারী, বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসে এরা বিভ্রান্তময়। [১৫]

সুতরাং, এটা তাই, সব ধরনের ধর্মিয় উপাদান ডারউইনবাদীদের কথোপকথনে থাকা স্বত্বেও, তারা এরপরও দাবী করে যে তারা একটি বৈজ্ঞানিক তত্ব উত্থাপন করছে, আর মানুষ, কোন বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্যপ্রমান এর পক্ষে না থাকার পরও এটাকে সত্য হিশেবে মেনে নেয়ার দিকে তাদেরকে ঠেলে দিচ্ছে। এই মতবাদের আবেদনের পেছনে কারন হোল সত্যকে পাশ কাটানো যা বেরিয়ে আসবে যদি তারা বিবর্তনকে পরিত্যাগ করে। আর সত্যটা হোল যে আল্লাহ্ (সৃষ্টিকর্তা) এই বিশ্ব ভ্রমান্ড এবং সমস্ত জীবকে সৃষ্টি করেছেন। এটাকে কখনই তাদের কাছে গ্রহনযোগ্য হবে না যারা পৃথিবীকে দেখে বস্তুবাদী এবং নাস্তিকতার আবরণে।

আর এই কারনেই এটা অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ন যে সচেতন, নীতিবোধ সম্পন্ন এবং বুদ্ধিমান লোকজন এই কুসংস্কারপুর্ন ধর্মের বিপদজনক প্রভাব দুনিয়ার উপর রাখছে তার থেকে সাবধান থাকুক এবং যা সত্য এবং সঠিক সেটার সঙ্গে থাকুক। সেই লক্ষে প্রথম পদক্ষেপ যা হবে তা হোল সঠিক বোঝাপড়া এই পৌত্তলিক অযৌক্তিক ধর্মিয় মতবাদ সন্মন্ধে। এরপর, জীবসৃষ্টির সত্যকে উপস্থাপন করা প্রকৃত উধাহরনের সঙ্গে যা এই কুসংস্কারকে করবে নিবির্য, আর আল্লাহ্ মহান কুরআনে যেভাবে বলেছেনঃ

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۚ

(না, আমরা সত্যকে মিথ্যার বিরুদ্ধে প্রক্ষেপণ করি, আর এইভাবেই মিথ্যা ধ্বংস হয়, লক্ষ্য কর, ইহা (মিথ্যা) নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।) [১৬]

২ অধ্যায়

ডারউইনবাদী ধর্মের উৎপত্তি

যদিও রীতিমাফিক এই তত্বের উদ্ভাবনের জন্য চার্লস ডারউইন ও তাঁর পরবর্তি অনুসারীদের কৃতিত্ব দেয়া হয়, তবে এর খুবই প্রাথমিক ধারনাটা লিখিত ইতিহাসের আদিতেই খুজে পাওয়া যাবে। আসলে, জীবনের উৎপত্তি একক সাধারণ কোষ থেকে এই বিশ্বাস পৃথিবীতে অনেক মানুষের মধ্যেই চালু ছিল, আদিম এবং সভ্যতার সময়ে, যা আমরা ধরে নিতে পারি যে সার্বজনিন ভাবে এই ধারনা মানুষের কল্পনা শক্তির ইতিহাসে বিরাজিত ছিল।

(আর্নেষ্ট এল আবেল, ancient views on the Origin of Life, Farleigh; Dickinson University press, 1973, p. 15.)

যদি কাউকে প্রশ্ন করা হয়, ‘‘ধর্ম কি’’ সে উত্তর দিতে পারে যে ধর্ম হোল আসমানী আইন এর সংমিশ্রণ যা মানুষকে আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলার পথ দেখায় এবং যার মধ্যে অসীম মঙ্গল বা কল্যাণ বিদ্যমান। কিন্তু এই সংজ্ঞা বা বৈশিষ্ট আজকের দুনিয়ার অনেক ধর্মের মধ্যে প্রয়োগ হয় না। আর এগুলোকে দুইটি মুল দলে অন্তর্ভুক্ত করা যায়ঃ একত্ববাদের ধর্মগুলি যেমন ইসলাম, খৃষ্টিয়ধর্ম এবং ইহুদিধর্ম যেগুলো আল্লাহর বাণী হয়ে মানবের জন্য এসেছে নবীদের মাধ্যমে, আর হোল কুসংস্কারসম্পন্ন্য ধর্ম যা মানুষ নিজেরাই উদ্ভাবন করেছে, যেগুলো কিছু বয়স্ক গৃহবধুদের গাল গল্পের বাইরে কিছু নয়।

একেশ্বরবাদী ধর্মগুলি মানুষকে আহ্বান জানায় একক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের, তাঁর নবীদের প্রতি, তাঁর পবিত্র গ্রন্থের প্রতি এবং শেষবিচারের দিনের প্রতি যেখানে আছে জান্নাত এবং জাহান্নাম (স্বর্গ এবং নরক)। কুসংস্কারময় ধর্মগুলি অন্য দিকে, মানুষকে সত্যের উল্টোদিকে গুষ্ঠিবদ্ধ করে, ব্যক্তিপূজার দিকে নিয়ে আসে, পৌত্তলিক উপাসনার অবক্ষয়িত গোত্রের মধ্যে নিমজ্জিত করে যার মধ্যে থাকে অদ্ভুদ সব মতবাদ এবং বিশ্বাস, তন্ত্রমন্ত্রের আকর্ষণ, নিয়মাবলী এবং আচার অনুষ্ঠান। এসবের মধ্যে যারা এধরনের ধর্মকে সমর্থন করে তারা বৃক্ষরাজিকে উপাসনা করে, অন্যরা করে সুর্য্যকে, কিছু বিশ্বাস করে বহিরাগতদের, অন্যরা পাথর বা কাঠের তৈরী মুর্তির সামনে করে নানা ধরনের কৃত্য, তাদেরকে উপঢৌকন দেয় তাদের সন্তুষ্টির জন্য আর আশা করে তারা কোন ফায়দা বা সুফল পাবে এর থেকে। যখন বিদ্যুৎ চমকায় তারা মনে করে তাদের দেবতা ক্রধান্বিত হয়ে আছেন; যখন আবার বৃষ্টি হয়, তারা সেটাকে মনে করে দেবতার ক্রন্দন। যেসব ব্যক্তিরা এসবের উপরে বিশ্বাস রাখে কুরআন’এ তাদেরকে বলা হয় মুর্তিপুজক, এর অর্থ এই যে তারা আল্লাহর সৃষ্টির কিছুকেই তাঁর সমকক্ষ করছে, আর যাকে পাশ্চাত্যের সাহিত্যে বলা হয় মুর্তিউপাসক বা নীচু ধর্মাবলম্বি (pagan)।

জীবনের গঠন এবং এসবের অস্তিত্বের ব্যাপারে যে ধারনা তারা ছড়ায় সেসব তাদের মুল অজ্ঞতারই বহিঃপ্রকাশ। তারা সাধারণভাবে বিশ্বাস করে যে এই ভ্রমান্ড এবং যাবতীয় প্রানী তৈরী হয়েছে, বাতাস, পানি ও আগুন থেকে অথবা তারা এসেছে বহির্জগত থেকে। আরেকটি সাধারণ ধারনা হোল যে এই বিশ্ব সব সময় ছিল আর অবিনশ্বর হয়েই থাকবে। নীচু ধর্মাবলম্বিরা বিশ্বাস করে যে এই বিশ্ব ভ্রমান্ডকে অস্তিত্বে এনেছে বৃক্ষ এবং পাথর এর ঈশ্বর যাদেরকে তারা উপাসনা করে। আর এই ভ্রান্ত বিশ্বাসীদের মতে প্রত্যেক ঈশ্বর বিশ্বের একেকটি অংশের সৃষ্টিকর্তা যে অংশকে তারা নিয়ন্ত্রন করে; আকাশকে এক ঈশ্বর, আরেকজন সমুদ্র এবং আর একজন পৃথিবী এবং মানব জগত।

ধর্ম নিয়ে তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায় যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মগুলোর বেশির ভাগের মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক প্রভাব এবং অনেক সদৃশতা তাদের বিশ্বাস এবং মতবাদের মধ্যে চিহ্নিত করা যায়। আদিম মুর্তিপুজার ধর্মগুলো যেমন গ্রীক এবং মেসোপটেমিয় বা বেবিলনীয়ান এসব ধর্ম থেকেই আজকের

অনেক আধুনিক ধর্মগুলো তাদের বিশ্বাস এবং মতবাদগুলো সামঞ্জস্বতায় গ্রহন করেছে। একটি কুসংস্কারময় ধর্ম যা এসবের থেকে উদ্ভুত হয়েছে সেটি হোল ডারউইনবাদের ধর্ম।

অন্যান্ন কুসংস্কারময় ধর্মগুলোর সঙ্গে ডারউইনবাদের অনেক সামঞ্জস্য রয়েছে বিশ্বব্রমান্ডের উৎপত্তি এবং জীব ও প্রাণীর ব্যাপারে এবং তাদের অনেক সাধারণ বিশ্বাস এবং মতবাদ গুলোর মধ্যে। বিরাট একদল মানুষের বিশ্বাসের বিপরীতে, ডারউইনবাদ প্রতিষ্ঠিত কোন বৈজ্ঞানিক তত্ব নয় যা সত্য, পরীক্ষা নিরীক্ষায় পর্যবেক্ষণ এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত বরং নিছক যুক্তিবাদী প্রয়াস, যার ভিত্তিই হোল অবৈজ্ঞানিক, যখন তারা বিশ্ব-ব্রমান্ড নিয়ে পর্যালোচনা করে। এই বই এর পরিধিতে ডারউইনবাদকে অন্যন্ন মানবসৃষ্ট ধর্মগুলোর সঙ্গে তুলনায় আলোচনা করা হবে - এর উৎপত্তি, এর প্রতিষ্ঠাতা, এর বাণী, দুনিয়া সন্মন্ধে এর ধারনা এবং এর ধর্ম প্রচারের কার্যক্রম নিয়ে।

ডারউইনবাদ এবং অন্যান্ন মানবসৃষ্ট ধর্মগুলোর মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই

ঊনবিংশ শতাব্দীতে চার্লস ডারউইন এবং আরো শৌখীন কিছু বৈজ্ঞানিকদের পর্যবেক্ষন বা গবেষণার তত্ব থেকেই ডারউইনবাদ প্রতিষ্ঠা পায় নাই বা শুরু হয় নাই। এর উৎপত্তি আরো অনেক আগে বস্তুবাদী দর্শন থেকে। ডারউইনএর বিশ্বাস প্রথম আবির্ভুত হয় বেশ কয়েক হাজার বছর আগে গ্রীক এবং সুমেরীয় বহু ঈশ্বরবাদী এবং বস্তুবাদী ধর্মগুলোর মধ্যেই। সুতরাং, চার্লস ডারউইন প্রথম ব্যক্তি নন যিনি বিবর্তন এর ধারণা উপস্থাপনা করেন; তিনি ছিলেন একজন নবিশ গবেষক যিনি এই মুল বিশ্বাসের রুপরেখাগুলোকে সন্নিবেশ করেছেন, একে মতবাদের ধারায় গড়েছেন আর পরে তাঁর তত্বকে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

কুসংস্কারবাদী সুমেরীয়দের খোদাইলিপিতে দেখা যায় তারা আল্লাহকে অস্বীকার করত এবং বিশ্বাস করত জীবন এসেছে বিবর্তন এর ধারায় আর সেটাই হয়েছে ডারউইন এর ধর্মের মুল স্তম্ভ বা মেরুদণ্ড। [১৭] সুমেরীয়দের খোদাইলিপি পরীক্ষা করে দেখা যায়, এক শ্রুতি যার মধ্যে পাওয়া যায় জলীয় বিশৃঙ্খলা থেকে উদ্ভব হয়েছে দুই ঈশ্বরেরঃ লাহমু এবং লাহামু। আর এই বিশ্বাস অনুযায়ী, এই দুই ঈশ্বর প্রথমে নিজেদের তৈরি করেন এবং পরে তারা বিবর্তিত হয়ে বস্তু এবং জীবন সমুহকে অস্তিত্য দেন। অন্যভাবে দেখলে, জীবনের আবির্ভাব হোল একবারেই হটাৎ করে জড় থেকে, জলীয় বিশৃঙ্খলা।

আদি যুগ থেকেই কুসংস্কারময় (pagan) লোকজন বাস করত। আর প্রতিটি যুগেই মানুষ তাদের দেবমুর্তি বা উপাস্য বস্তু নিজেরাই তৈরী করেছেন। আর একইভাবে ডারউইনবাদীরা এই সন্নিপাতকে মেনে নেয়, আর জড় বস্তুকে উদ্ভাবক শক্তি বা সৃষ্টিময় করে তোলে, আদিম যুগে ভ্রান্তময় বিশ্বাসে এইধরনের বস্তুকেই সৃষ্টিকর্তা হিসেব উপাসনা করা হোত।

প্রথম ছবিঃ সুমেরীয় ফলক যার মধ্যে তাদের কুসংস্কারময় বিশ্বাসের ভিত্তিতে বর্ননা করা হয়েছে মানবের জন্ম বা উৎপত্তির বিভিন্ন ধাপ জল দেবতার নির্দেশে।

২য় ছবিঃ সুর্য্য দেবতা ও বিশৃঙ্খলার দেবতা।

৩য় ছবিঃ সুমেরীয় জল দেবতার অনুসারী বা প্রতিভূ।

বিবর্তনবাদীরা বিশ্বাস করে যে প্রথম প্রাণের উৎপত্তি হয় জড় বা প্রাণহীন জিনিষ থেকে আর যার বিরাট সাদৃশ্য রয়েছে সুমেরীয়দের বিশ্বাসের সঙ্গে যারা মনে করে এই বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

আদিম মিশরীয় ধর্মগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে একই ধরনের বিশ্বাস লালিত হয়েছে, "সাপ, ব্যাঙ, কীট পতঙ্গ এবং ইদুর এই সবকিছুকে বলা হয়েছে যে নীল নদের প্লাবন থেকে জমে যাওয়া তলানী থেকে এসবের সৃষ্টি।"[১৮] অন্য ভাবে বললে, সৃষ্টিকারকের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা, মিসরীয়রা আরো বিশ্বাস করত যে সব জীব কাঁদা মাটি থেকে এমনিতেই সৃষ্টি হয়েছে। সৃষ্টির রূপকথায় মিসরীয় এবং বেবিলনীয় ধারণায় আরও যোগ আছে, 'আদিম সমুদ্র থেকেই পৃথিবী এবং মানুষ আবির্ভুত হয়েছে।'[১৯]

এটা ভাবলে ভুল হবে যে এইসব ধারনা ইতিহাসের কুজ্ঝটিকায় বিলীন হয়ে গেছে এবং আদিম সভ্যতার সঙ্গে নষ্ট হয়ে গেছে। আজকে বিবর্তনবাদিরা একই ধারনা পোষণ করছে; তারা বৈজ্ঞানিক দুনিয়াকে বিশ্বাস করতে বলে যে শুরুতে ছিল সেই সমুদ্র, এরপর জলীয় বিশৃঙ্খলা, অথবা তারা যে ভাবে বলে, 'আদ্যি সুরুয়া' –primeval soup. বিবর্তনবাদের তত্ব অনুযায়ী, ৪ বিলিয়ন বছর পুর্বে নিশ্চেতন কিছু রাসায়নিক উপাদান আদিম আবহমন্ডলে জীবন উৎপাদনের জন্য জরুরি যেমন কার্বন এবং ফসফরাস, হটাত সুযোগের ক্রিয়াশীলতায় সংস্পর্শে আসে জলীয় পরিমণ্ডলে এবং খুবই পরিমিত পরিমাপে। এর মধ্যে বিদ্যমান ছিল ঝড় সহ বজ্রপাত আর ভূমিকম্প, আর এই সময়েই জীবনের প্রথম উপাদান অ্যামাইনো এসিড আসে অস্তিত্বে। এইভাবে একইপ্রক্রিয়ায় এই অ্যামাইনো এসিড প্রটিন (দেহসার) এ পরিবর্তিত হয়ে যায়, দেহসার পরিবর্ত্তিত হয় কোষ এ (সেল) এবং এই চলমান প্রক্রিয়ার আবর্তে এলোমেলোভাবে উদ্ভুত অবস্থার মধ্যেই অবশেষে মানবের উৎপত্তি বা সৃষ্টি ঘটে ...।

যাহাই হোক, জড়পদার্থের সঙ্গে একসঙ্গে বেড়ে উঠে জীবন গঠিত হওয়ার দাবী কখনই যাচাই বা প্রতিপন্ন করা হয় নাই পরীক্ষা বা নিরীক্ষণ এর মাধ্যমে; এটা একটি বিজ্ঞান অনিসৃত দাবী। প্রত্যকটি প্রানী কোষ অস্তিত্তে আসে আর একটি প্রাণী কোষের বিভাজনের মাধ্যমে। এই বিশ্ব ভ্রমান্ডে কেহই, এমনকি কোন অতি আধুনিক পরীক্ষাগারে, জড় পদার্থ থেকে কোন প্রাণের আবির্ভাব ঘটাতে সক্ষম হয় নাই, আর এটাই প্রমান করে যে প্রথম কোষটি নিশ্চই সুনির্দিষ্ট ইচ্ছায় বা উদ্দেশ্যে তৈরী হয়।

হিন্দুধর্ম, দক্ষিণ এশিয়ায় এই জটিল পৌত্তলিক আচার বিধান এর প্রচুর অনুসারী আছে, আর এই ধর্মও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একই বিশ্বাসে যে সব জীবন আবির্ভুত হয়েছে সমুদ্র থেকে। এই বিশ্বাস উদ্ভাসিত হয়েছে রীগ ভেদা এবং অথর্ব ভেদা ধর্মশাস্ত্রে যে সবের মধ্যে হিন্দু মতবাদের বিভিন্ন পৌরাণিক চরিত্রের অনেক গল্পের বিবরণ রয়েছে। হিন্দুধর্ম একজন সৃষ্টিকর্তার ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে, আর এর দর্শন অনুযায়ী, পুরো বিশ্ব ভ্রমান্ড আবির্ভুত হয়েছে এক বিশাল গোলাকৃতির বস্তুগত পদার্থ 'প্রকৃতি' থেকে। সবকিছু, জীব ও জড়, বিবর্তিত হয়েছে এই আদিম বস্তু থেকে। আর প্রতিটি মহাজাগতিক মহাকালের শেষে প্রতিটি বস্তু আবার তাঁর পুর্বের অবস্থায় বিলীন হয়ে যাবে প্রকৃতিতে, এর পর আবার পুরো বিবর্তন ব্যবস্থা ফিরে যাবে শুরুতে।[২০] তার মানে, এই বিশ্ব আবার সংশোধিত হবে এই আদিম জীব হীন অবস্থা থেকে।

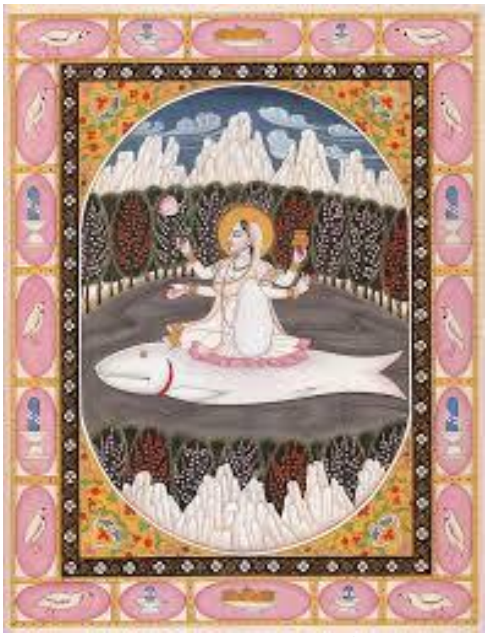

নদী দেবী -হিন্দু ধর্ম

ডারউইনবাদী ধর্মের সবচেয়ে বিশাল যে অচলাবস্থা তা হচ্ছে প্রাণ কিভাবে প্রথম আবির্ভুত হয় এই প্রশ্নে। বিবর্তনবাদীরা সাধারণভাবে এই প্রশ্নটি এড়িয়ে চলেন কারন খুব সম্ভাব্য স্থুল উত্তরটি তারা দিতে পারবেন সেটা শত শত বছরের পুরনো ধর্মগুলোর উত্তরের থেকে ভিন্ন নয়। যে সময়টাতে ডারউইনবাদের উৎপত্তি, প্রাণের গঠন সংক্রান্ত ভ্রান্ত বিশ্বাস তখনও অনেক প্রচলিত; মাছি এসেছে মিষ্টি থেকে, ব্যাঙ এর উদ্ভদ হয়েছে কাঁদা থেকে আর পিপড়ারা এসেছে চিনি থেকে।
এই সব অর্থহীন এবং অসম্ভব বিশ্বাস গুলোর মধ্যে হচ্ছে 'আশাময় দৈত্য' – hopeful monster, বিবর্তনবাদের ইতিহাসে এক অতি অদ্ভুদ তত্ব। আসল কথা হোল যে আশায় অপেক্ষায় থাকা পরিবর্তন কালীন জীবাশ্ম (fossil) আর পাওয়া হোল না, তখন অনেক বিবর্তনবাদীরা বেশ চাপের মধ্যে ছিলেন। এর পর তারা সিদ্ধান্ত নিলেন যে পরিবর্তন কালীন সময়ের কোন কিছুর দরকার নেই কেননা একটি প্রজাতি থেকে আরেকটি প্রজাতির উদ্ভব হটাত করেই হয়েছে। সেইপ্রক্ষিতেই তারা 'আশাময় দৈত্যের' ধারনা প্রস্তাব করে। এই তত্ব অনুযায়ী, , পিঁপড়ারা যেমন এসেছে চিনি থেকে, প্রাণীর গঠন কোনভাবেই এই দাবি থেকে ভিন্ন নয়। প্রথম পক্ষী এসেছে হটাত করে কোন সরীসৃপ এর ডিম থেকে; পরে, একই ভাবে আর এক পক্ষী দৈবক্রমেই হটাত আর একটি ডিম থেকে এসেছে। আর এই দুই পাখীর সংমিশ্রণে পক্ষিকুলের জন্ম হয়। এই একই তত্ব চার্লস ডারউইন প্রস্তাব করেন যে পানিতে বেশী সময় অতিবাহিত করেছে সে হয়ে গেছে তিমি সময়ের ব্যাবধানে। যাহাইহোক, আজকের বৈজ্ঞানিক সত্য পরিস্কারভাবে দেখিয়ে দেয় যে কতখানি অবৈজ্ঞানিক আর প্রতারণা পুর্ন এই দাবী।[২১]

একই নিম্নধারনা চলতেই থাকল

কুসংস্কারময় এসব ধর্মের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট হচ্ছে প্রাণহীন প্রতিমা এবং অন্যান্ন বস্তু যেমন কাঠ আর পাথর এসবের সঙ্গে শক্তি বা ক্ষমতার গুণাবলী কিভাবে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে, যেসবের কথা বলার উপায় নেই বা কোন শক্তি আছে। এরপরও মানুষ এসবের কাছ থেকে আনুকূল্য বা সুবিধা প্রত্যাশা করে এমনকি বিশ্বাস করে যে এইসব প্রাণহীন জড় মুর্তি পৃথিবী এবং প্রাণী সমুহকে সৃষ্টি করেছে, এই বিশ্বকে দিয়েছে গতি, আর যোগাড় দিচ্ছে নিত্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় কিছুর মানুষের প্রয়োজনে, দিচ্ছে স্বাস্থ্য এবং অনুকম্পা। মজার ব্যাপার হোল, একই ধারনা এবং বিশ্বাস আধুনিক বিবর্তনবাদীদের মধ্যেও লক্ষ করা যায়। যেভাবে পৌত্তলিকরা (pagan) যুগে যুগে বিশ্বাস করছে জড় মুর্তিদের মধ্যে রয়েছে সৃষ্টির শক্তি, বিবর্ত্তনবাদীরা বিশ্বাস করে যে প্রাণহীন পদার্থ যার নিজের কোন চেতনা বা হুস নাই এইসব অনু পরমাণুর রয়েছে সৃষ্টির ক্ষমতা। তারা দাবী করে যে প্রানহীন এইসব বস্তু দৈবক্রমে একত্রিত হয়, নিজেদের সংগঠিত করে এবং তৈরী করে জীবন্ত বস্তুর যার মধ্যে আছে নিখুত এবং অতি জটিল সব বৈশিষ্ট। এর মধ্যে অতি বিখ্যাত সেই উপাস্য বস্তুটি হোল, যা শুধু সেই আদিম যুগের নামটিই বদলিয়েছে – 'প্রকৃতি' অথবা 'মা প্রকৃতি' (mother nature)।

ঘুর্ণিঝড়, ভুকম্পন এবং বন্যা এসবকে সম্পৃক্ত করা হয় মা প্রকৃতির ক্রোধ অথবা প্রকৃতির লিলা খেলা হিশেবে, কিন্তু কেহই বুঝাতে পারে না এই শক্তিটা কি যাকে বলা হচ্ছে 'প্রকৃতি' । আর ঠিক একই ধারনা পুরনো সমাজগুলিতেও বিদ্যমান ছিল তবে তা ছিল একটু ভিন্ন নামে। গ্রীক পৌরাণিকে মা প্রকৃতিকে বলা হোত 'গাইয়া' এবং মুর্তি উপাসক ধর্মগুলোতে এটাকে জানতো প্রাচুর্যের দেবী হিশেবে। আর বিবর্তনবাদীরা কি করেছে, তারা শুধু এসবের নাম এবং প্রতীক গুলিকে পরিবর্তন করেছে, সম্পৃক্ত করেছে একই শক্তিকে অসচেতন অণুর সঙ্গে।

আসলে, বিবর্তনবাদীরা এটাকে খোলাখূলি ভাবেই মেনে নেয়। একজন বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানী যার নাম জেমস লাভলক – James Lovelock, প্রস্তাব করেন যা পরিচিত 'গাইয়া তত্ব' নামে আর এই তত্ব অনুসারে পৃথিবী গ্রহ হোল জীবন্ত বস্তু। এটাই হোল উদাহরন যা প্রকাশ করে যে বিবর্তনবাদীরা যাকে 'তত্ব' হিশেবে জাহির করছে সেটা হোল মুলত মুর্তিউপাসক চিরায়ত ধর্ম গুলোরই বিশ্বাস।

হুট করে বা এমনিতে তৈরী হওয়ার সেই শক্তি ও জীবহীন বস্তু অথবা অস্বচেতন অণু'র উপর বিশ্বাস স্থাপন করাটা অবশ্যই যুক্তি বা সত্যের অপলাপ। ঠিক যেমন পৌত্তলিক ধর্মাবলম্বিরা যেভাবে মানতেন যে জীবহীন মুর্তি সৃষ্টি করেছে সবকিছু, সেইভাবে বিবর্তনবাদীরা মনে করে প্রাণহীন বস্তুই সৃষ্টি করেছে জীবের। আর এইসব বিশ্বাসের উৎস নিহিত রয়েছে এই চিন্তায় যে সবকিছুই কোনভাবে স্বর্গীয়, এজন্য জড়বস্তুরও বুদ্ধি আছে, রয়েছে ইচ্ছা শক্তি আর এইসবের সামর্থ্য আছে সিদ্ধান্ত নেয়ার আর সেসব বাস্তবায়ন করার।

বিবর্তনবাদী বৈজ্ঞানিক লাভলক, যিনি প্রস্তাব করেন যে পৃথিবী গ্রহের জীবন আছে। তিনি বলেছেন 'গাইয়া' থেকে উদ্বুদ্ধ হয়েই তিনি এটা উল্লেখ করেছেন। গ্রীক পৌরাণিক অনুযায়ী গাইয়া ছিলেন ধরিত্রীর দেবী

কুরআনের মধ্যে আল্লাহ্ তাদের সন্মন্ধে বলেছেন যারা তাঁকে ব্যতিত অন্য কাউকে উপাসনা করে এবং নিজে মুর্তি বানিয়ে তাঁকে ঈশ্বর হিশেবে গ্রহন করে। তিনি বর্ননা করেন তাঁর রসুল এবং এই ধরনের লোকদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষের কথা। এই রকম একটি নিকৃষ্ট গোত্রের কথা কুরআনে উল্লেখ করেছেন ইব্রাহীমের সময়ঃ

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَـٰٓأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْـًٔا (٤٢)

"(উল্লেখ কর) যখন সে তাঁর পিতাকে বলল, 'ও আমার বাবা, যে শুনতে পায় না এবং দেখতেও পারে না আপনি কেন তাঁর উপাসনা করেন এবং যে আপনার কোন উপকারেও আসে না?"[২২]

এই আয়াতে যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, ইব্রাহীমের পিতা এবং তাঁর গোত্র প্রাণহীন শক্তিবিহীন এইসব মুর্তির অবয়ব নিজ হাতে অলংকৃত করত এবং সেসবকে ঈশ্বর হিশেবে

গ্রহন করত। তাদের উপাসনা করত এবং মনে করত যে তারা তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা এবং প্রয়োজন মেটাবে, তাদের জরা বা অসুস্থতাকে নিরাময় করবে এবং তাদেরকে হয় কাঠিন্য অথবা মহিমান্বিত করবে।

সুর্য্য উপাসনা

অন্য আর এক ধরনের সাদৃশ্য হোল আধুনিক বিবর্তনবাদী এবং অতিতের সেই সব মুর্তি উপাসক সমাজের মধ্যে যে এরা সবাই সুর্য্য উপাসক। সুর্য্য উপাসনা ইতিহাসের আদি পর্ব থেকেই চলে আসছে। মানুষ জানত সুর্য্য তাদের আলো এবং উষ্ণতা সরবরাহ করে, সুতরাং তারা নিজেদের এর জন্য নভোমন্ডলের এই বস্তুর কাছে ঋণী মনে করত আর মনে করত এই ঈশ্বর। অতিতে এই ভ্রান্ত ধারনা অনেক লোককে আল্লাহ্‌র সত্য ধর্ম থেকে দূরে রেখেছে। কুরআন এই বিষয়ের উপর আলোকপাত করে আর উল্লেখ করে সলোমন নবীর (সুলাইমান) সময় কিভাবে সেবা'র লোকজন সুর্য্যকে উপাসনা করতঃ

وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَعْمَـٰلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ (٢٤) أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِى يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (٢٥)

আমি তাঁকে ও তাঁর সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে সুর্যকে সেজদা করছে। শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যাবলী সুশোভিত করে দিয়েছে। অতঃপর তাদেরকে সৎপথ থেকে নিবৃত করেছে। অতএব তারা সৎপথ পায় না। তারা আল্লাহ্‌কে সেজদা করে না কেন, যিনি নভোমন্ডল ও ভুমন্ডলের গোপন বস্তু প্রকাশ করেন এবং জানেন যা তোমরা গোপন কর ও যা প্রকাশ কর। [২৩]

এটা সত্য যে সুর্য পৃথিবীকে আলো এবং উষ্ণতা সরবরাহ করে, কিন্তু যে এর জন্য কৃতিত্ব দাবী করতে পারে সে হোল আল্লাহ্‌, যিনি এই সুর্যকে তৈরী করেছেন। সুর্য হোল বস্তুময় জিনিস যার কোন চেতনা নাই; একসময় ছিল যখন এর অস্তিত্ত ছিল না এবং এক সময় এর জ্বালানির উৎস নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং এটা নিভে যাবে। সম্ভবত আল্লাহ্‌ তায়ালা সেই দিনের আগেই এটাকে ধ্বংস করে দেবেন। স্বর্গীয় অন্যসব কিছুর মত তিনি সুর্যকে তৈরী করেছেন কোন কিছু ছাড়াই (শূন্য থেকে) এবং সেজন্যই শুধু আল্লাহরই প্রশংসা এবং তাঁকেই মহিমান্বিত করা উচিত এসবের অস্তিত্তের জন্য। এক আয়াতে এই সত্যকে এসব কথায় প্রকাশ করা হয়েছেঃ

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (٣٧)

"তাঁর নিদর্শন সমুহের মধ্যে রয়েছে দিবস, রজনী, সুর্য ও চন্দ্র। তোমরা সুর্যকে সেজদা করো না, চন্দ্রকেও না, আল্লাহকে সেজদা কর, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা নিষ্ঠার সাথে শুধুমাত্র তারই এবাদত কর।" [২৪] (কুরআন এক্সপ্লোরার থেকে ক নেয়া)

এটা খুবই মজার ব্যাপার হোল যে আধুনিক বিবর্তনবাদীরা পুরনো সুর্য উপাসকদের মুল বিশ্বাসকেই ঝালিয়ে এইভাবে প্রকাশ করে যে তারা তাদের অস্তিত্তের জন্য সুর্যের কাছে ঋণী।

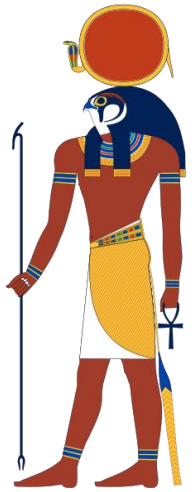

অতিতে বিভিন্ন সমাজ সুর্য পুজায় বিশ্বাস করত। একইভাবে আজকের বিবর্তনবাদীরা মনে করে যে সুর্যই প্রাণ গঠনের নেপথ্যে। কেউ কেউ আবার এর থেকে আরও এগিয়ে গিয়ে বলেন যে সুর্য উপাসনা আমাদের পুর্বসুরীর একটি অতি বুদ্ধিমান বিশ্বাস।

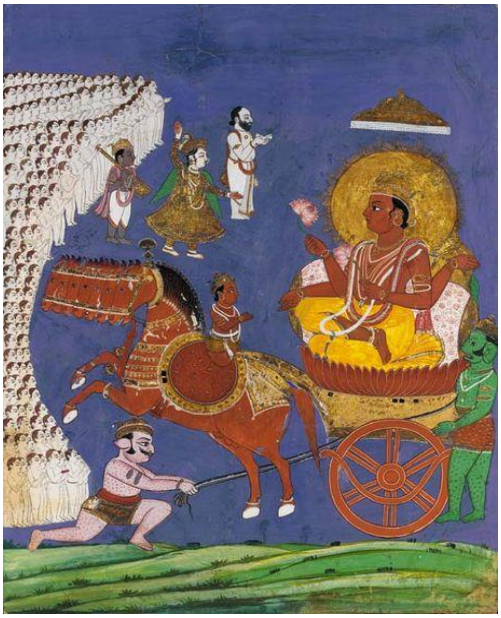

যখন বিবর্তনের শুরুটা ধরা হয় তখন সুর্যকেই এই ধরিত্রীর সমস্ত জীবের উৎস হিশেবে মেনে নেয়া হয়। তাদের মতে, সুর্যের আলোর কারণেই প্রথম জীবনের উৎপত্তি হয় এই পৃথিবীতে। পরবর্ত্তিতে এই সুর্যের আলোর শক্তিতেই বিভিন্ন জীবের গঠন এবং পরিবর্তন সূচিত হয়। এই ক্ষেত্রে বিবর্তনবাদীদের অভিগমনটা উত্তম ভাবে সারসংক্ষেপ করেছেন আমেরিকার নাস্তিক বিবর্তনবাদী এবং ধর্মের শত্রু, কার্ল সাগান – Carl Sagan. তাঁর বই কসমস'এ সাগান বলেন, "যদি আমাদের উপাসনা করতেই হয় আমাদের থেকে বড় কোন শক্তির তাহলে এটা কি অর্থবহ নয় যে সুর্য এবং নক্ষত্রগুলোকে আমরা ভক্তি করি?" একই বই এ তিনি লিখেন, " **আমাদের পুর্বপুরুষরা সুর্যকে উপাসনা করত যা একেবারেই বোকামী নয়"**।[২৫]

কার্ল সাগান'এর শিক্ষক, বিবর্তনবাদী জোতির্বিদ হার্লো শেপলি – Harlo Shapley, তাঁর অভিমতের জন্য পরিচিত হয়েছেন, "কিছু ধর্মনিষ্ঠরা বলে, 'শুরুতেই, ঈশ্বর...' কিন্তু আমি বলি, 'শুরুতেই, হাইড্রোজেন'"। শেপলি বিশ্বাস করত যে প্রথম উপাদান যার অস্তিত্ত ছিল তা হচ্ছে হাইড্রোজেন এবং এই গ্যাস, সময়ের ব্যবধানে, আপনা থেকেই উৎপাদন করেছে মানব জাতি, পশু এবং বৃক্ষরাজি।

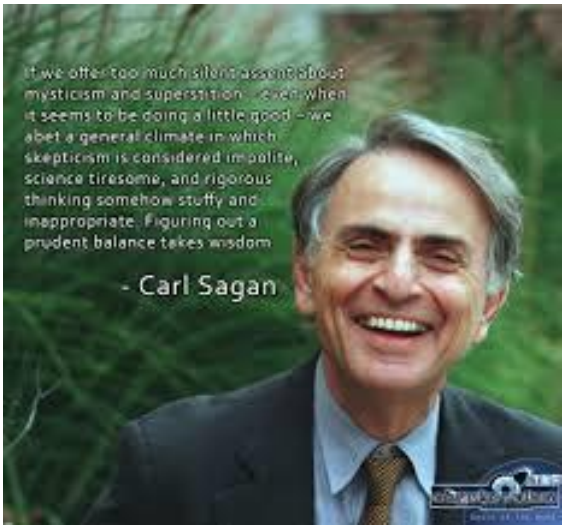

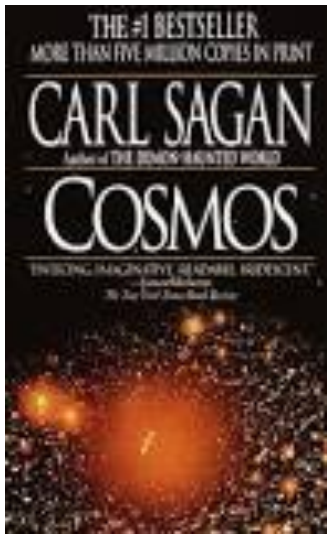

কার্ল সাগান এবং তাঁর বই কসমস, যার মধ্যে তিনি সুর্য পুজাকে প্রশংসনীয় করেছেন

এইসব কিম্ভূত সব বিবর্তনবাদী ধারনার মুলে রয়েছে বৈষয়িক বস্তুগত বিষয় এবং প্রকৃতি; বিবর্তনবাদীরা মুলত পুজা করে বৈষয়িক বস্তু এবং প্রকৃতির। কিন্তু যে কেহ তার বুদ্ধিমত্তায় এটুকু বুঝতে সক্ষম যে এই ভ্রমান্ড কোন প্রাণহীন এবং অচেতন বিষয়ের উৎপাদন নয়, বরং, সে দেখতে পাবে এক অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার এক বিশাল কলেবর প্রতিটি বৈশিষ্টে এবং এতে রয়েছে শৈল্পিক উৎকর্ষতা এবং বিরাট এক অভিপ্রায়। সে উপলব্ধি করতে পারে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ত তাঁর নিখুত এবং সম্পুর্ন নির্ভুল সৃষ্টিতে। কিন্তু আজ কিছু লোক এই বাস্তবতায় রয়েছে অন্ধকারে এবং রাণী শেবা'র আমলের লোকের মত বস্তু বা পদার্থের উপাসনা করেই চলছে।

وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيۡطَـٰنُ أَعۡمَـٰلَهُمۡ فَصَدَّهُمۡ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمۡ لَا يَهۡتَدُونَ (٢٤)

"এবং শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যাবলী সুশোভিত করে দিয়েছে। অতঃপর তাদেরকে সৎপথ থেকে নিবৃত্ত করেছে। অতএব তারা সৎপথ পায় না" [২৬]

ভ্রান্ত ধর্মগুলীর বিকৃতিঃ ঈশ্বরকে অস্বীকার

বিবর্তনবাদী ভাবধারার ধর্মগুলোর মধ্যে হচ্ছে কনফুসিয়াস, তাও এবং বুদ্ধ এদের ধর্ম। অন্যসব পুত্তলিকা উপাসক ধর্মগুলোর মত, বুদ্ধ ধর্ম সৃষ্টিকর্তা আছে এই ধারণাকে অস্বীকার করে, বিশ্বাস করে যে এই ভ্রমান্ড কারও সৃষ্টি নয়, চিরন্তনভাবে এর আবির্ভাব হচ্ছে এবং সমকালীন বুদ্ধবাদ এই ধারনাকেই গ্রহন করে।[২৭]

এই সকল বিশ্বাস ডারুউইনবাদী ধর্মের মত একই সমান্তরালে পরিলক্ষিত হয়ঃ সৃষ্টি কর্তা হীন, পানি হোল প্রথম পদার্থ যা প্রাণী বা জীবকে উদ্ভাবন করেছে এই এক বিশ্বাস, আবার বিশ্বাস হোল জীব আবির্ভুত হয়েছে জড় বস্তু থেকে এবং বিকশিত বা উন্নিত হয়েছে অন্যান্য প্রানবাহি প্রজাতিতে, আরও বিশ্বাস করে যে কোন কিছুই বুদ্ধিমতা দিয়ে তৈরী হয় নাই বরং এলোপাথাড়ি কিংবা হঠাত সঙ্ঘটিত হয়েছে।

বুদ্ধ ধর্মাবলম্বিরা বুদ্ধার মুর্তির পুজা করে যা তারা নিজ হাতে তৈরী করে এইভেবে যে তারা তাদেরকে শুনে এবং দেখে।

এই সময়ে, কোন বিজ্ঞানীই যাদের বাস্তব বিচার ক্ষমতা রয়েছে তারা উপরের তালিকায় যেসব বিশ্বাসীদের উল্লেখ করা হয়েছে তাদের পক্ষ নিতে পারে না কেননা বিজ্ঞান প্রদর্শন করেছে যে প্রানবাহী জীবদের তৈরী করা হয়েছে এক চমৎকার বৈশিষ্টে এবং অসাধারণ মেধায় এবং পরিকল্পনায়। প্রসিদ্ধ নামগুলির মধ্যে একজন যার প্রসিদ্ধি বিস্তার লাভ করেই চলছে 'বুদ্ধিমান পরিকল্পনা' intelligent design, তত্বে তিনি হচ্ছেন আমেরিকার জীব রসায়নবিদ মিখায়েল জে বেহে – Michael J. Behe, যিনি লিখেছেনঃ ***উভয়সংকট হোল এই যে যখন একপক্ষ এই ব্যাপারটা আখ্যা দিচ্ছে বুদ্ধিমান পরিকল্পনা, অন্য পক্ষের আখ্যা হচ্ছে ঈশ্বর।*** [২৮]

বাস্তব হচ্ছে, বিবর্তনবাদী মন কখনই গ্রহন করতে পারে না যে আল্লাহ'র অস্তিত্ব আছে, এবং তিনি এই বিশ্বকে নিখুঁতভাবে এবং নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে তৈরী করেছেন। যাহাইহোক, এই অবশ্য সত্যিকে বোঝার জন্য মুহুর্তের বেশী সময় লাগে না। কুরআনের মধ্যে বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ্ মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন তাঁর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করার জন্যঃ

أَفَلَمْ يَنظُرُوٓاْ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَٰهَا وَزَيَّنَّٰهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ (٦) وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَٰهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَٰسِيَ وَأَنۢبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍۭ بَهِيجٍ (٧) تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ (٨) وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً مُّبَٰرَكًا فَأَنۢبَتْنَا بِهِۦ جَنَّٰتٍ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ (٩) وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ (١٠) رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ۖ وَأَحْيَيْنَا بِهِۦ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذَٰلِكَ ٱلْخُرُوجُ (١١)

তারা কি তাদের উপরিস্থিত আকাশের পানে দৃষ্টিপাত করে না – আমি কিভাবে তা নির্মান করেছি এবং সুশোভিত করেছি, যার মধ্যে কোনই অসংগতি নেই।৬ আর জমিন – আমি বিস্তৃত করেছি সুপরিসরে, তাতে পর্বতমালা করেছি গ্রথিত শক্তভাবে, এবং সেখান থেকে সব ধরনের নয়নাভিরাম উদ্ভিদ উদ্ভবের ব্যাবস্থা করে দিয়েছি।৭ আর এইভাবে প্রদান করেছি এক অন্তর্নিহিত ধারনা এবং যা স্মরণ করিয়ে দেয় প্রতিটি মানবকে যারা স্ব-অনুরাগে আল্লাহ'র প্রতি আকৃষ্ট হয়।৮ এবং আমি আকাশ থেকে কল্যাণময় বৃষ্টি প্রদান করি যার কারনে বাগান তৈরী হয় এবং হয় শস্যের ক্ষেত।৯ এবং দীর্ঘ খেজুর গাছ যাতে আছে ভরা খেজুর,১০ এইভাবে মানব সকলের জন্য আসে জীবিকা; আর এসবের মাধ্যমে আমি মৃত জমিনকে ফিরিয়ে আনি জীবনেঃ এমনিভাবে ঘটবে পুনরুত্থান (মানুষের মৃত অবস্থা থেকে)১১

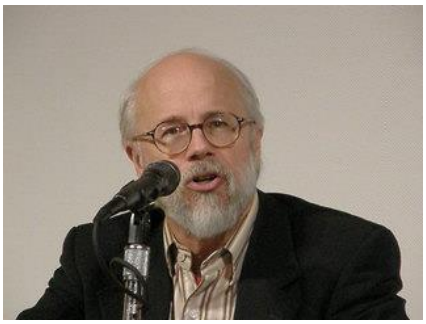

মাইকেল বেহে

চারিদিকের অগুনিত জীবের প্রমান সত্যেও, বিজ্ঞানীরা যারা তাদের সচেতনতা থেকে বুঝতে পারে এবং উদ্ধত চিন্তার খপ্পর থেকে বেরিয়ে আসতে পারে যা অস্বীকার করে আল্লাহ্‌কে, তারা সরাসরি সৃষ্টি কর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে ফেলে। কিন্তু ডারউইনবাদীরা, যারা তাদেরকে এই ধরনের চিন্তার ধারা থেকে অনাচ্ছাদিত করতে পারে না, পৌত্তলিক সংস্কারের অদ্ভুদ সব বিশ্বাসকে তারা মর্যাদা দিয়েই যায়, এছাড়াও নিজেদেরকে উপস্থাপন করার চেষ্টা করে বিজ্ঞান এবং যৌক্তিক চিন্তার আঁধার হিশেবে।

পৌত্তলিক গ্রীক চিন্তাবিদ্গানই ডারউইনবাদের প্রথম বীজ বপন করেছিলেন

ডারউইনবাদী ধারনার পুর্বমত উপস্থাপনা করেন দার্শনিক গ্রীক মিলেসিয়ান – Milesian (খৃষ্টপুর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দির দার্শনিক যারা প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করেছেন নুতন এক যৌক্তিক ধারনায় এবং তখন এটাকেই বলা হোত প্রথম বৈজ্ঞানিক দর্শন) যার পদার্থ, রসায়ন বা জীববিজ্ঞানের নিয়ম নীতির কোন ধারনাই ছিল না। এইসব দার্শনিকদের চিন্তার এক বিশিষ্ট দাবি হচ্ছে, যাদের মধ্যে রয়েছেন, থেলস -Thales , আনাক্সিমান্দের - Anaximander, এবং এমপেওডকলেস – Empedocles, সেটা হোল জীবন্ত বস্তুর (প্রাণী, মানব এবং উদ্ভিদ) জন্ম হয়েছে আপনা থেকেই জড় পদার্থ যেমন, বাতাস, আগুন এবং পানি থেকে। এই তত্ব অনুযায়ী প্রথম জীবের আবির্ভাব হয়েছে হটাত করে এবং আপনা থেকেই পানির মধ্যে এরপর কিছু জীব পানি ছেড়ে ডাঙ্গার বসবাসে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয়।

প্রথম মিলেসিয়ান চিন্তাবিদের মধ্যে ছিলেন থেলস। তিনি বাস করতেন এক উপকুলবর্তী শহরে এবং মিশরে বহু সময় ব্যয় করেন যেখানে তিনি নীল নদী তীরের অধিবাসীদের উপর এর গুরুত্বে প্রভাবিত হয়ে পড়েন। তিনি আবিষ্ট হয়ে পড়েন এই ধারনায় যে জীবন্ত বস্তুর উদ্ভব হতে পারে পানির থেকে। তার এই সিদ্ধান্তে পৌছানোতে কোন পরীক্ষা বা বৈজ্ঞানিক কোন বিশ্লেষণ ছিল না ছিল সাধারণ যুক্তির সমাহার। পরে, অন্যান্ন মিলেসিয়ান দার্শনিকগন অনেক তত্ব দেন একই ধারনার উপর ভিত্তি করে।

এম্পেডকেলস

থেলস এর পরে খুবই গুরুত্বপুর্ন চিন্তাবিদ ছিলেন তারই ছাত্র আনাক্সিমান্দের, যিনি বস্তুবাদী মতবাদে দুটি গুরুত্বপুর্ন উপাদান যোগ করেন পশ্চিমা দুনিয়ার চিন্তাধারার ইতিবৃত্তে। প্রথমটি হোল এই বিশ্ব আগেও ছিল এবং থাকবে চিরন্তন এবং অবিনশ্বর। দ্বিতীয়টি হোল, যা থেলস এর সময় থেকেই সংগঠিত হচ্ছিলঃ যে জীবের উদ্ভব হয়েছে একে অপরের থেকে। আনাক্সিমান্দের এমনকি একটি পদ্যও লিখেছিলেন যার নাম ছিল ‘প্রকৃতি’, যেটা হচ্ছে প্রথম সাহিত্য যার মধ্যে বিবর্তনের তত্ব সন্নিবেশিত রয়েছে। এই কবিতায় তিনি লিখেছেন জীবের উদ্ভব হয়েছে আঠালো জিনিষ থেকে যা সুর্যের আলোতে শুকিয়ে যায়। তিনি মেনে নেন যে প্রথম প্রাণীটি কাঁটা বা সুচের মত জিনিষ দিয়ে আবৃত ছিল এবং সমুদ্রে বাস করত। আর এই মাছের মত দেখতে জীবটি আবর্তিত হয়, তারা ডাঙ্গায় চলে আসে, তারা তাদের গায়ের কাটাগুলি ফেলে দেয় এবং এইভাবে অবশেষে মানুষের রুপ ধারণ করে।[৩০] দর্শনের বই গুলি বিশ্লেষণ করে কিভাবে আনাক্সিমান্দের বিবর্তন তত্বের গোড়ার আকার প্রদান করেনঃ

আমরা দেখতে পাই মিলেসিয়ান আনাক্সিমান্দের (৬১১-৫৪৬ খৃঃপুর্ব) বুনিয়াদী বিবর্তন তত্বকে এগিয়ে নেন, যা তাঁর সময়ে মোটামুটি ভাবে চালু ধারনা, যে জীবের প্রথম আবির্ভাব ঘটে একধরনের প্রাণ পুর্ব সুরুয়া -pre- biotic soup, জাতীয় পদার্থে, সুর্যের আলোর সাহায্যে এর পরিবর্তন

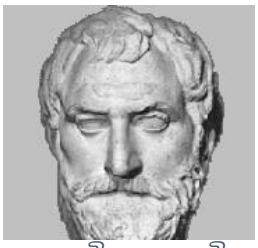

থেলস দাবী করেন যে জীব রা পানি থেকে নিজেরাই উদ্ভুত হতে পারে

ঘটে। তিনি বিশ্বাস করেন যে প্রথম প্রাণী উৎপন্ন হয় সামুদ্রিক আঠালো প্যাঁক থেকে যা সুর্যের আলোর সাহায্যে জলীয় অংশ নিঃশেষিত করে (শুকিয়ে যায়)। তিনি আরো বিশ্বাস করেন যে মানুষ মাছের থেকেই অবতীর্ন হয়েছে।[৩১]

আমরা আনাক্সিমান্দের ধরনের ব্যখ্যার সাক্ষাত পাই চার্লস ডারউইনের বই – *প্রজাতির উৎস* – The Origin of Species এ। মুলত এখানে কোনই পার্থক্য নেই বিবর্তনের যে তত্ব সেখানে প্রস্তাব করা হয়েছে (অসাড় বৈজ্ঞানিক দাবি সত্যেও) ও প্রাচীন গ্রীকের পৌত্তলিক সংস্কারের মধ্যে বাস করা মিলেসিয়ান দার্শনিকদের যে বিবেচনা বা বর্ননা, তার মধ্যে।

ডারউইন এর তত্বের আসল উপাদান হোল, 'প্রাকৃতিক নির্বাচন বা বাছাই' এর ধারনা, এটার মুলেও আছে প্রাচীন গ্রীক সংযোগ। গবেষণা মুলক নিবন্ধে যাতে বলা হচ্ছে প্রাকৃতিক নির্বাচনের কারন হচ্ছে বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে অস্তিত্তের লড়াই যা প্রথম পরিলক্ষিত হয় গ্রীক দার্শনিক হিরাক্লিটাস – Heraclitus, এর কাজে। হিরাক্লিটাস এর প্রবন্ধ অনুযায়ী, প্রানীকুলের মধ্যে রয়েছে অনন্ত লড়াই। আর ধরতে গেলে এটাই হচ্ছে ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনের তত্বের উৎপত্তি সুত্র ২,৫০০ বছর পরে।

এম্পেডকেলস – Empedocles, (৪৯৫-৪৩৫ খৃঃপুঃ), যার জীবনকাল থেলস এবং আনাক্সিমান্দের এর পর, যিনি বিশ্বাস করতেন পৃথিবীতে সবকিছুরই উদ্ভব হয়ছে এলোপাথাড়ীভাবে পানি, বাতাস, আগুন এবং মাটির বিভিন্ন পরিমাপে সংমিশ্রনের মাধ্যমে। লেখক ডেভিড স্কজাএরলুন্দ – David Skjaerlund, যিনি অনুসন্ধান করেছেন বিবর্তন তত্বের দার্শনিক ভিত্তির উপরে তাঁর বই Philosophical Origins of Evolution – 'বিবর্তনের দার্শনিক উৎস' এর মধ্যে, তিনি উল্লেখ করেন এম্পেডকলেস এর কিছু চমৎকার ধারনা ছিল; তিনি ''বিশ্বাস করতেন শুধু দৈবতা বা সুযোগই (chance) পুরো প্রক্রিয়াটার জন্য দায়ী আর মানুষের উদ্ভব হয়েছে উদ্ভিদের প্রাণ থেকে,"[৩২] দৈবতা বা সুযোগের এই ধারনা প্রাচীন ধর্মগুলোতে একটি মৌল বিষয়ের গঠন পেয়েছে আর ডারউইনবাদী ধর্মেও পেয়েছে খুবই গুরুত্বপুর্ণ প্রতিমুর্তি।

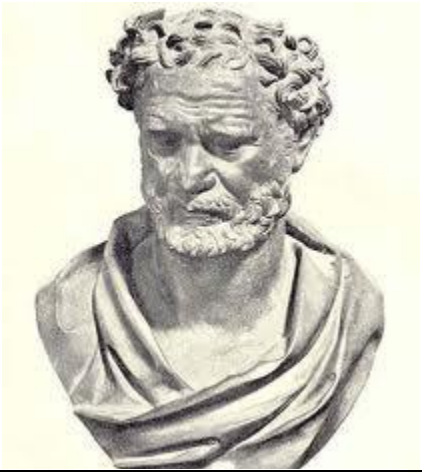

ডেমোক্রিটাস, আধুনিক বস্তবাদীদের মতই ভুল বিশ্বাস করতেন যে বস্তু হোল চিরঞ্জিব এবং বস্তু ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্ব নেই।

ডেমোক্রিটাস হলেন আরেকজন গ্রীক দার্শনিক যিনি বিবর্তন তত্বে অনেক সংযোগ এনেছেন এবং ঐসব বস্তুবাদী দর্শনেও যেসব এই তত্বকে ভিত্তি হিশেবে পরিগনিত করে। ডেমোক্রিটাস এর মতে, এই বিশ্ব ভ্রমান্ড গঠিত হয়েছে অতি ক্ষুদ্র কণা দিয়ে যার নাম হচ্ছে 'এটম' এবং এর বাইরে কিছুরই অস্তিত্ত নেই। এটম সবসময় ছিল – সৃষ্টি করা হয় নাই এবং অবিনশ্বর। সেইহেতু, এই পদার্থ সবসময় বিরাজমান এবং চিরন্তন ভাবে এর অস্তিত্ত থাকবে। ডেমোক্রিটাস যে কোন ধরনের আধ্যাত্মিক বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং দাবি করেছেন আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ, এমনকি নৈতিকতা, এসবকেও এটমে অবমুল্যায়ন সম্ভব (can be reduced to atoms)। এইভাবে, ডেমোক্রিটাসকে বলা হোত সত্যিকারের প্রথম বস্তুবাদী দার্শনিক; যার কাছে এই বিশ্বের কোন উদ্দেশ্য নেই, সবকিছু চলে এক অন্ধ অপরিহার্যতায় এবং সবকিছুই অস্তিত্তে এসেছে স্বতস্ফুর্তভাবে আপনা থেকেই। এখানে আবার স্মরণ হয়ে যায় আধুনিক বিবর্তনবাদীদের কৃত্তিম ঈশ্বর – অচেতন এটম – unconscious atoms.

অচেতন এটমগুলি দিয়ে দুনিয়া গঠিত হয়েছে – এই পৃথিবী, বাতাস যা দিয়ে আমরা শ্বাসপ্রশ্বাস নেই, আমরা যা খাই এবং পান করি, আমাদের শরীর – সংক্ষেপে, যা কিছুই আমরা অনুভব করতে পারি সব কিছুর কেন্দ্রে রয়েছে ডারউইনের তত্ব। এটা সর্বজন বিদিত যে প্রত্যেক জীবন্ত বস্তু, মানব সহ, গঠিত হয়েছে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, লৌহ এবং অন্যান্ন পদার্থের এটম দ্বারা। ডারউইনবাদ দাবি করে যে এইসব এটম সংগঠিত হয়েছে এলোপাথাড়ি ভাবে এবং দৈবক্রমে। এই অস্পর্শকাতর, অর্থহীন দাবি অনুযায়ী, বিভিন্ন এটম যা সংগঠিত হয় অজানা এক আকস্মিক শক্তি বা ধাক্কায়, পরে একত্রিত হয় দৈবক্রমে এবং তৈরী করে গ্রহ, তারা এবং স্বর্গীয় অবকাঠামোর। আরও পরে অনেক এটম একত্রিত হয় দৈবক্রমে এবং তৈরী করে অতি জটিল প্রাণ কোষের কাঠামো। এরপর এই প্রাণ কোষ এক লম্বা বিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়ে জীবন্ত বস্তু গঠন করে যার মধ্যে

থাকে অস্বাভাবিক সবিস্তর এক পদ্ধতি এবং পরিশেষে আসে মানবকুল যার মধ্যে আছে অতি উচ্চমানের চেতনা আর আত্মজ্ঞান। উপরন্তু, মানুষ যার উদ্ভব হয় শুধুই হটাত সংঘটিত কারনে, হটাত করে আবিষ্কৃত যন্ত্রের (যেমন ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র) সাহায্যে আবিষ্কার করে সেই এটম (অণু) যার থেকে তাঁর উৎপত্তি! আর এইটাকেই বৈজ্ঞানিক গবেষনালব্ধ উপাদান হিশেবে চালিয়ে দেয়া হয়!

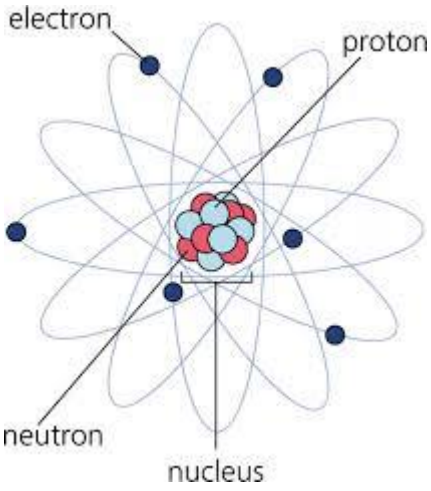

এইভাবে, বিবর্তন তত্ব সত্য হিশেবে গ্রহন করে যে প্রতিটি পরমাণু একটি ঈশ্বর যার মধ্যে রয়েছে সৃষ্টির শক্তি এবং উদ্দীপনা। কিন্তু যে পরমাণু গুলি গঠন করে আত্মজ্ঞান সম্পন্য বুদ্ধিমান মানুষ, নিজেরাই স্বচেতনতা এবং উদ্দিমতাহীন। তা সত্বেও বিবর্তনবাদীরা দাবী করে যে এইসব প্রাণ হীন পরমানূ সংগঠিত হয়, তৈরী করে মানুষ আর এর পরে পরমানুদের এই সংমিশ্রণ সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা মহাবিদ্যালয়ে যাবে এবং নিজস্ব পেশা গড়বে। যাহাইহোক, প্রতিটি গবেষণা এবং পর্যবেক্ষন দেখিয়ে দেয় যে স্বচেতন সংগঠন ছাড়া, বস্তু কখনই নিজেকে সংগঠিত করতে পারে না; বরং এসব ছত্রভঙ্গ এবং বিশৃঙ্খলার দিকেই এগিয়ে যায়। আর এই কারনে এটা অবস্যম্ভাবি যে কোন কিছুই এই বিশ্বে সুযোগে বা হটাত করে ঘটে নাই বরং এসবকে অস্তিত্বে নিয়ে এসেছে একটি স্বচেতন উদ্দমি, জ্ঞানি এবং বিজ্ঞ কেউ। আর এইসব হচ্ছে আল্লাহ্‌র গুণাবলী, দুনিয়ার এবং স্বর্গের প্রভু।

বিবর্তনবাদীরা দাবী করে যে পরমাণুরা হটাৎ করেই তৈরী হয় এবং পুরো বিশ্বভ্রমান্ডকে উত্থিত করে। সেটা এরকম, যে একদল জড় পরমাণু আকাশের তারাদের জন্ম দেয়,দেয় গ্রহ এবং পৃথিবীর; আর এক দল জন্ম দেয় প্রাণী সকলের। এরপর আর এক দল অসচেতন পরমাণু তৈরি করে চোখ, হৃদয়, স্নায়বিক পদ্ধতির, মগজ বা বুদ্ধির এবং সমস্ত নিখুত দেহতন্ত্র মানুষের জন্য। পরে, এই মানুষ অধ্যাপক হয় এবং পরমাণু নিয়ে পরীক্ষা বা গবেষণা শুরু করে যা তাঁকে সৃষ্টি করেছে। এটা সুস্পষ্ট যে এই ধরনের দাবী অ-প্রত্যয়যোগ্য এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির থেকে বহু দূরে। পুরা বিশ্ব এবং এর মধ্যে প্রতিটি প্রাণী নিখুতভাবে তৈরী হয়েছে মহিমান্বিত ও সর্বচ্চ জ্ঞানী আল্লাহ্‌র দ্বারা।

পুর্বে যে সব দার্শনিকদের উল্লেখ করা হয়েছে, আরেকজন ডারউইনবাদী ধর্মের উল্লেখযোগ্য সহযোগী হচ্ছেন গ্রীসের দার্শনিক এরিস্টটল। এরিস্টটলের মতে, বিভিন্ন প্রজাতিগুলোকে সাজানো বা সুবিন্যস্ত করা যায় একটি ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগে- সহজ থেকে খুব জটিল এবং সাজানো যাবে রেখাক্রিতির সিড়ির ধাপে ধাপে; তিনি এই তত্বকে বলেছেন স্কালা ন্যচারি – Scala Naturae। এরিস্টটলের এই ধারনা পশ্চিমা ধ্যান ধারণায় গভীর প্রভাব ফেলে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যুন্ত এবং এরপর রুপ নেয় ***মহান অস্তিত্বের সম্পর্ক*** - The Great Chain of Being, এই বিশ্বাসের মুল সুত্রে যা পর্যায়ক্রমে আবির্ভুত হয় বিবর্তনবাদের তত্বে।

প্রাচীন কুসংস্কারময় সংস্কৃতির অন্য আর এক বিশ্বাসঃ

মহান অস্তিত্বের সম্পর্ক

ডারউইনবাদের অন্তর্নিহিত ধারনা – প্রতিটি জীবই বিবর্তিত হয়েছে পদার্থ থেকে – আর *মহান অস্তিত্বের সম্পর্ক* এই ধারনা প্রথম সন্মুক্ষিন হয় গ্রীসের দার্শনিক এরিস্টটল এর মাধ্যমে। এই বিবর্তনের বিশ্বাস আজও জনপ্রিয় সেইসব দার্শনিকদের কাছে যারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্তকে অস্বীকার করে।

মুল গ্রীস ধারণায়, প্রথম জীব (জীবিত বস্তু বা প্রাণী) স্বতস্ফুর্তভাবে বা আপনা আপনি ভাবে নিজেকে তৈরী করে পানি থেকে আর যা সময়ের আবর্ত্তে *মহান অস্তিত্তের সম্পর্ক* এই মতবাদে পরিনত হয়। স্কালা ন্যাচারী'র মতে যা ২০০০ বছর ধরে গৃহীত হতে থাকে, সকল জীব নিজেরাই গঠিত হয়, খনিজ পদার্থ থেকে আবর্তিত হয়ে জৈব পদার্থে রুপ নেয়, জীবন্ত অবয়ব থেকে এরপর উদ্ভিদ, জন্তু, মানব এবং অবশেষে দেবতাকুলের উদ্ভব ঘটে। প্রাথমিকভাবে, এই ধারণা প্রস্তাবে আসে কেবল দার্শনিক দৃষ্টি কোন থেকে। আর এই বিশ্বাস অনুযায়ী নুতন নুতন অঙ্গ প্রতঙ্গের জন্ম নেয় প্রকৃতির চাহিদা অনুযায়ী। প্রকৃতভাবে, এই ধারনার প্রস্তাব আসে কেবলই দার্শনিক দৃষ্টি কোন থেকে। আর এই বিশাল যুক্তি পটে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবগুলো ক্রমে এবং ধাপে ধাপে বড় বড় প্রানীতে

গঠিত হয়; সব জীব এই ক্রম প্রক্রিয়ায় নিজের নিজের অবস্থান করে নিয়েছে। এটা আরও সুদৃঢ় ভাবে প্রকাশ করে যে, পাথর, ধাতু, পানি এবং বাতাস জীবে পরিণত হয়, জীব পরিবর্তিত হয় জন্তু তে এবং জন্তু পরিণত হয় মানবে এই প্রক্রিয়ায় কোন রকম প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই । যে কারনে এই বিশ্বাস (যার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই, বিজ্ঞানের সব ভিত্তির যা বিপরীতে যায় এবং শুধুই অমুর্ত বা ভাবমুলক যুক্তির উপরে দাঁড়িয়ে থাকে) এত লম্বা সময় নিয়ে এর স্বীকৃতি জয়ের কারনটা কিন্তু বিজ্ঞান নয় বরং আদর্শগত। যা এই ভ্রান্ত বিশ্বাসকে সুযোগ করে দেয় তা হচ্ছে এর মতবাদ বা উদ্ধত অভিগমন যা মুলত আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। আর এই বিশ্বাস সময়ে সময়ে এর নাম বদলায়, বিশ্লেষিত হয় আর অবশেষে পরিচিতি পায় 'বিবর্তন তত্ব' হিশেবে।

বস্তুবাদী গ্রীকের প্রভাব এবং জোতির্বিজ্ঞানে রোমদের দর্শন

বস্তুবাদী ধারণার বস্তু উপাসক গ্রীক এবং রোম দার্শনিকরা শুধু বিবর্তন তত্বের উজ্জীবনই করেন নাই বরং বস্তুবাদী বিশ্বের ও জোতিষশাস্ত্রে বস্তুবাদী ধ্যান ধারনারও প্রবর্তন করেছেন। উনিশ শতকের জোতির্বিজ্ঞানের ভ্রান্ত ধারণা হোল বিশ্ব ভ্রমান্ড সব সময়ই অস্তিত্তে ছিল এটা হোল বস্তুবাদী মতবাদ যার শেকড় রয়েছে গ্রীক এবং রোমদের পৌরাণিক গল্পগাথায়। যাহাই হোক, বিশ শতকে এসে বিগ ব্যাঙ তত্বের গ্রহনযোগ্যতার পরে, এটা এখন বদ্ধমূল হয়েছে যে এই ভ্রমান্ডের একটি শুরু ছিলঃ তাঁর মানে, এর সৃষ্টি করা হয়েছে শূন্য থেকে।

আদিম গ্রিক প্রভাব এবং রোমদের জোতিষশাস্ত্রের কুসংস্কারের উদাহরন তাদের অল্প কিছু প্রতিকি নাম করন থেকে সহজেই বোঝা যায়। গ্রহ নক্ষত্র এবং স্বর্গীয় জিনিষের নাম করন করা হয়েছে গ্রীক এবং রোমীয় পৌরাণিক গল্পগাথা অনুযায়ী। মারকুরী গ্রীক-রোম ধর্ম অনুযায়ী হোল ব্যবসা বা বানিজ্যের দেবতা; ভেনাস হোল ভালবাসার দেবতা, মারস হোল যুদ্ধের দেবতা, আর যুপিটার হোল সবচেয়ে পুরনো সর্বোচ্চ দেবতা, শনি ছিল কৃষি দেবতা, ইউরেনাস ছিল আদিম অনন্য দেবতা এবং আকাশের একছত্র অধিপতি, নেপচুন হোল সাগরের দেবতা এবং প্লুটো ছিল মৃতদের দেবতা এবং প্রেতলোক বা যমপুরীর অধিকারী। এন্ড্রোমেডা ছায়াপথ বা নক্ষত্রপুঞ্জের নাম নেয়া হয়েছে গ্রীক পৌরাণিক গল্পের এন্ড্রোমেডার গল্প অনুযায়ী। তিনি ছিলেন হাবাসি রাজকন্যা যাকে তথাকথিত সাগর দেবতা পোছাইডন হত্যা করার চেষ্টা করেছিল।

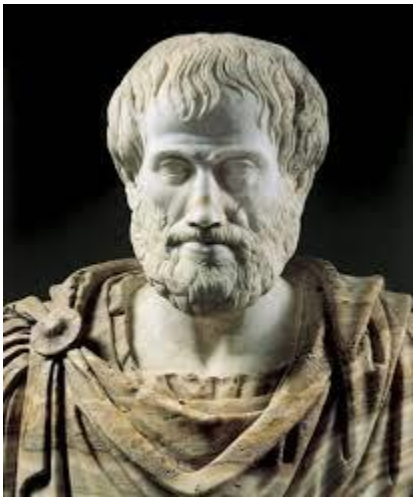

গ্রীস দার্শনিক এরিস্টটলঃ তাঁর রচনা, স্কালা নাচারি ছিল আধুনিক বিবর্তনবাদীদের প্রেরনার মুল উৎস

যেহেতু বস্তুবাদী দর্শনের উৎস হোল পৌরাণিক গ্রীক, বস্তুবাদী বিজ্ঞানীরা যারা জোতির্বিজ্ঞানএর প্রতিষ্ঠাতা তারা তাদের মুল অনুপ্রেরণাই গ্রহন করেছেন গ্রীক এবং রোমদের পৌরাণিক কল্প কাথা থেকে। 'অবিনশ্বর ধরিত্রি'র মডেল, যেভাবে ১৮ এবং ১৯ শতাব্দীতে প্রবলভাবে প্রতিরক্ষার আবর্তে রক্ষিত হয়েছে, বিংশ শতাব্দির বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন সে সবকে নাকচ ও অমুলক করে দিয়েছে । এটা উদঘাঁটিত হয়েছে যে বিশ্ব ভ্রমান্ডের অস্তিত্ব সব সময়েই ছিল এটা একটা ভ্রম ধারণা, যেমনটি বিশ্বাস করা হোত তথাকথিত ঈশ্বর গ্রীক – রোম এদের পৌরাণিক কল্পকাহিনীতে । বাস্তবে, আল্লাহ্‌ এই বিশ্ব ভ্রমান্ড সৃষ্টি করেছেন – স্বর্গীয় বস্তু থেকে সুঙ্খ উপকরন পর্যুন্ত সবকিছু – এবং শূন্য থেকে ।

কিন্তু এটা অবশ্যই পুনারাবৃত্তির প্রয়োজনঃ এই তথাকথিত ক্রমিক আয়োজন বিজ্ঞানকে হিসেবের মধ্যে নেয় না। এর মধ্যে জীবিত বস্তুর শারীরিক গুণাবলীর কোন বিবেচনা নেই বা নেই জীবন কিভাবে জড় পদার্থ থেকে উদ্ভব হতে পারে অথবা পানিতে বিচরণকারী প্রাণী কিভাবে সমতল এর জীবনে খাপ খাইয়ে নেয়। পরিবর্ত্তন কালীন অবয়ব, যা কি না প্রজাতিদের মধ্যে উদ্ভবের পারস্পরিক সম্পর্ককে উপস্থাপন করে যা আজকে বিবর্তন তত্বের মধ্যে গঠন করে চরম সংকটের কেননা সেসব তথ্য জীবাশ্মের তথ্যে পাওয়া যায় নাই। কিভাবে প্রজাতিগুলো অন্যপ্রজাতিতে রূপান্তরিত হয় সেটা এক বিরাটা রহস্য হয়ে আছে কেননা যে শৃঙ্খল বা সংযোগমালা সেটা মুলত ভাসাভাসা অবাস্তব কিছু যুক্তি যা মুলত আবিষ্কৃত হয়েছে প্রাচিন কিছু দার্শনিকদের গল্পের টেবিলে।

এরিস্টটল সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্তকে অস্বীকার করেছেন যিনি সবকিছুর সৃষ্টি করেছেন শূন্য থেকে বরং উল্টো এই ধারণা প্রচার করেছেন যে ঈশ্বর আবর্তিত হয়েছে মুলত মানব থেকেই। আর এই ভিত্তিহীন ধারণা সৃষ্টির মাধ্যমেই এরিস্টটল বিশালভাবে বস্তুবাদী গ্রীক দার্শনিকদের প্রভাবিত করেছেন। যে

সময়কালে Scala Nature পশ্চিমা চিন্তা চেতনায় আসে সেটা ছিল মানবতাবাদ ও নবজাগরণের সন্ধিক্ষণ। ১৫ শতাব্দির শুরুতে গ্রীক এবং ল্যাটিন মতবাদগুলো ইউরোপে আসে এবং পশ্চিমা চিন্তা চেতনায় এবং দর্শনে অনুপ্রবেশ করে। আর এই সবের অগ্রভাগে ছিল বস্তুবাদ এবং শ্রষ্টার অস্তিত্ত অস্বীকারের মতবাদ।

আর এই শ্রষ্টা বা ঈশ্বর বিহীন ভাবনায়, মানুষ তাঁর নিজের উপর এবং এই ধরাধমের উপর সম্পুর্ন নিয়ন্ত্রনের সামর্থ পেয়েছে বলে মনে করে আর মনে করে যে এই জীবনের পরে বা মৃত্যুর পর আর কোন জীবন থাকবে না। সুতরাং গ্রেট চেইন অফ বেইং এই বিশ্বাসের ভিত্তি হিশেবে পরিগনিত হয় এই উল্লেখ করে যে মানবকুল আসলে দৈবক্রমে অস্তিত্তে আসে বা সৃষ্টি হয় বিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্যে এবং একটি সাধারণ ঘটনা বই এর বাইরে মুলত আর কিছু নেই। আর এই জন্য, নৈতিক মূল্যবোধ এবং মানব ভাবাবেগ গুরুত্বপুর্ন নয়; একজন ব্যক্তির উচিত প্রতিটি দিন উপভোগ করা যতদিন বেচে থাকবে এবং কারও কাছে তাঁর কোন দায় বদ্ধতা উপলব্ধি করবে না। এরিস্টটলের ধর্মতত্ব বা অমরতা যা তাঁর স্কালা নাচারি'র শীর্ষে ছিলো তা প্রতিস্থাপিত হোল মানুষের

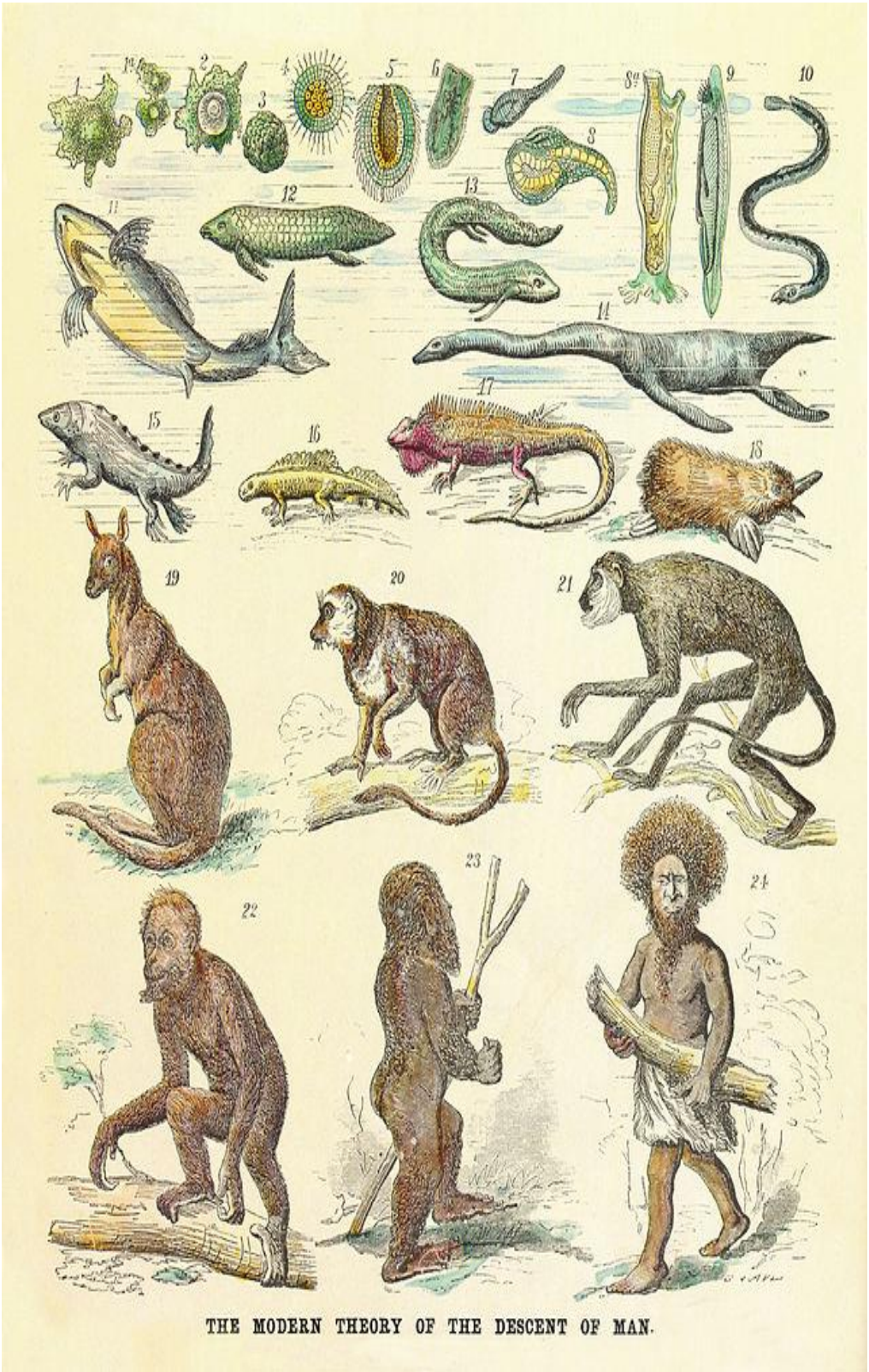

মানবতাই সর্বচ্চ এই ধারণায়। গ্রেট চেইন অব বেইং ছিল বেশ জনপ্রিয় রেনেসাঁস থেকে ১৮ শতাব্দী পর্যুন্ত এবং সেই সময় কালের ভোগবাদী বিজ্ঞানীদের

মধ্যে বিশাল প্রভাব বিস্তার করে । ফরাসি বিজ্ঞানী, বুরনোয়া ডু মেলে – Benoit de Maillet, পিয়ার ডু মপোয়াটুস - Pierre de Maupertuis, কোন্ট ডু বুফোঁ - Comte de Buffon, এবং জ' ব্যাটিস্ট লামার্ক - Jean Baptiste Lamarch ও আরও অনেকে যাদের বিরাট প্রভাব ছিল চার্লস ডারউইন এর উপর আর এসব ব্যক্তিরাই গ্রীক মতবাদ গ্রেট চেইন অব বেইং অধিকার করে নেয় । তাঁরা তাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে বিবর্তনের এই ধারার উপর ভিত্তি করে নেয়। এদের মধ্যে সামঞ্জস্য এক জায়গায় যে বিভিন্ন প্রজাতি আলাদাভাবে সৃষ্ট নয় বরং আপনাআপনি গঠিত হয় বিবর্তনের প্রক্রিয়ার মধ্যে পারিপার্শিক অবস্থা এবং পরিবেশের উপর ভিত্তি করে। আর যা ডারউইন এর আদর্শের সঙ্গে মিলে যায়। আর এই কারনেই বলা যায় যে

আধুনিক বিবর্তন ভাবনার জন্ম হয় ফরাসীতে।

গ্রেট চেইন অব বেইং এই ধারনামতে, যা এরিস্টটলের সময়কালে নিয়ে যায়, জীবন্ত বস্তু সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী থেকে বিরাট প্রাণীতে বিবর্তিত হয়েছে। আর আধুনিক বিজ্ঞান দেখিয়েছে যে এই দাবি ভিত্তিহীন; বিভিন্ন জীবের মধ্যে সাদৃশ্য বিবর্তনের প্রমান নয়; ছবির প্রানি গুলি অন্য প্রানীর বিবর্তিত রুপ নয় বরং প্রতিটি প্রাণীই তাদের বর্তমান অবয়বেই সৃষ্টি হয়েছে।

ফরাসী বিবর্তনবাদী কোন্ট ডু বুফোঁ ১৮ শতাব্দীর প্রতিথযশা বৈজ্ঞানিক ছিলেন। ৫০ বছরেরও বেশী সময় ধরে তিনি প্যারিসের রয়াল বোটানিকাল গার্ডেনের পরিচালক ছিলেন। ডারউইন বেশীরভাগ তত্বই এঁর কাজের উপরে ভিত্তি করে গড়ে তুলেন। তাঁর ৪৪ খন্ডের হিসটয়রে নাসারালে – Histoire Naturelle ডারউইন যা কিছু ব্যবহার করেছেন তার বেশীর ভাগই পাওয়া যাবে।

Pierre de Maupertuis

গ্রেট চেইন অব বেইং বিবর্তনের মুল ভিত্তি ছিল ডু বুফোঁ এবং লামার্ক দুজনের ধারনার মধ্যেই। আমেরিকার বিজ্ঞানের ইতিহাসবিদ ডি, আর, ওল্ডরয়ড – D.R. Oldroyd, এদের দুজনের সম্পর্ককে এভাবে নির্ধারন করেছেনঃ –

তাঁর হিসটয়রে নাসারালে, বুফোঁ নিজেকে প্রকাশ করেছেন গ্রেট চেইন অব বেইং এই মতবাদের একজন উদ্গাতা হিশেবে, যেখানে এই চেইনের সর্বাগ্রে মানুষকে রেখেছেন... লামার্ক একই মতবাদের (গ্রেট চেইন অব বেইং) পুরনো ধারার অনুসারী ছিলেন। এরপরও, এটাকে কঠিন বা স্থীর কোন গঠন প্রক্রিয়া হিশেবে মেনে নেয়া হয় নাই। তারা সংগ্রাম করেছেন পরিবেশ বা প্রকৃতির হিসেব নিকেশে সামঞ্জস্যপুর্ন

কিছুতে পৌছাতে ও বংশগতি হতে অর্জিত গুণাবলির নিতিমালার সাহায্যে, জিবসত্বাগুলি নিজেরাই এই চেইনের উপরের দিকে অবস্থান করে নিতে পারে বলে অনুমিত করা হোত – জীবাণু থেকে মানবে, এইভাবেই বলা যায়... সর্বপরি, নুতন নুতন জীবসত্বা গুলি প্রতিনিয়তই এই চেইনের শুরুতে এসে দেখা দিচ্ছিল, কেননা তাদের উদ্ভব হচ্ছিল স্বতস্ফুর্তভাবে অজৈব পদার্থের মধ্যে থেকে... চেইনে আরোহনের এই চলতি প্রক্রিয়া ছিল জটিল এর কারন হোল তথাকথিত 'জীবনের শক্তি – power of life'. [33]

যে কেউ পরিস্কারভাবে এটা দেখতে পারে, "বিবর্তনের তত্ব – theory of evolution' যাকে বলা হয়, আসলে এটা প্রাচীন গ্রীক কল্পকাথা – গ্রেট চেইন অব বেইং এরই আধুনিক সংস্করণ। ডারউইন এর আগেও বিবর্তনবাদীরা ছিলেন এবং তাদের অনেক ধ্যান ধারণা এবং তথাকথিত প্রমান ইতিমধ্যেই

গ্রেট চেইন অব বেইং এর মধ্যে পাওয়া গেছে। ডু বুফোঁ এবং লামার্ক এর মাধ্যমে গ্রেট চেইন অব বেইং বৈজ্ঞানিক জগতের কাছে পেশ করা হয় এক নুতন ভাবে আর যা ডারউইনকে প্রভাবিত করে।

De Buffon and his 44 volume work Histoire Naturelle, which takes its inspiration from ancient pagan mythology.

অবশ্যই, ডারউইন এই ধারণায় এপর্যুন্ত হোল এই ভাবধারা। ডারউইন এর শতাব্দী - Loren Eiseley উল্লেখ করেন যে ডারউইন অরিজিন অব স্পেসিস- The Origin of বস্তু অবধারিতরূপে ধাবিত হচ্ছে 'উতকর্ষতার সেখানেই এর উতস খুজে পান। [৩৪]

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ডারউইন নুতন কোন তত্ব তা নুতন অভিব্যক্তিতে প্রকাশ করেছেন বিভ্রান্তিকর বা চাতুর্যপুর্ন নিরীক্ষণের উপর ভিত্তি গ্রীকদের কল্পকাথার পৌত্তলিকতায়। এটাকে বিজ্ঞানী তাদের নুতন নুতন ধারণা যোগ করে। The Origin of Species এর মাধ্যমে এই ইতিহাসে এক বিশাল মিথ্যাভাষণ এ পরিগনিত

প্রভাবিত ছিলেন যে তাঁর পুরো তত্বের যুক্তির মুল ভিত্তিই Darwin's Century, এই বই'এ লরেন ঈজেলি – ১৮ শতাব্দীর অস্তিত্তের সিঁড়ি'র ধারণা তাঁর বই দা Species ব্যবহার করেন এবং এই ধারনা যে জৈব সব ক্রমবৃদ্ধির দিকে'- progress towards perfection,

প্রস্তাব করেন নি। তিনি যেটা করেছেন সেটা হোল তিনি সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক ভাষায়, এর বেশী কিছু নয়। কিছু করে, একটি ধর্ম ফিরে গেছে সুমেরিয়ান এবং প্রাচীন আরও বর্দ্ধিত করেছেন ১৭ এবং ১৮ শতাব্দীর অনেক পরবর্ত্তিতে, ডারউইনের বই দা অরিজিন অব স্পেসিস – তত্ব বৈজ্ঞানিক ব্যহ্যাবরন গ্রহন করে যা বিজ্ঞানের হয়।

লরেন এইজেলি

জিন ব্যাপ্টিষ্টস লামার্ক

আধুনিক বিবর্তনবাদীরা অন্ধভাবে আজও বিশ্বাস করে যে এক মায়াময় (অলীক) ঈশ্বর যাকে বলা হয় মা প্রকৃতি – mother nature, তাদের সৃষ্টি করেছেন, যা প্রকাশ করে একই অজ্ঞানতা ও বিবেকহীনতা প্রাচীন গ্রীক বা সুমেরিয়ানদের মত যারা নিজের মনের মধ্যে সৃষ্ট কল্পিত ঈশ্বরের উপাসনা এবং আরাধনা করত। এই ধর্ম কতখানি খাপছাড়া এবং অযৌক্তিক সেটা বুঝতে হলে শুধু দরকার চারিদিকে পর্যবেক্ষন করা, সব কিছুর মধ্যে যে শুঙ্খাতিশুঙ্খ বর্ণনা রয়েছে যা এসবের সৌন্দর্য্য, নকশা এবং মহান শৈল্পিক গুণাবলীকে প্রকাশ করে। খুবই সাধারণ জ্ঞানে এই ধারণা আত্মস্থ করা যায় যে এই বিমুর্ত, নির্ভুল ও নিখুত সৃষ্টি গুলো এমনিতেই অস্তিত্তে আসে নাই বা অন্ধ কোন সুযোগে কোন ক্ষমতাহীন দেবতার মাধ্যমে বা প্রকৃতির সমাহারে যার শুরু ধরা হয় এক ধরনের আদিম সুপ বা সুরুয়া এবং বিজলী চমকের স্বান্নিদ্ধে। ঈশ্বরহীন অন্ধ ভাবনায় নিমজ্জিত হৃদয়গুলো কখনই এসব বিশ্বাস করবে না যেমনি কুর'আন এ বর্নিত হয়েছেঃ

وَقَالُواْ مَهۡمَا تَأۡتِنَا بِهِۦ مِنۡ ءَايَةٖ لِّتَسۡحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحۡنُ لَكَ بِمُؤۡمِنِينَ

তারা আরও বলতে লাগল, আমাদের উপর জাদু করার জন্য তুমি যে নিদর্শনই নিয়ে আস না কেন আমরা কিন্তু তোমার উপর ঈমান আনছি না। ৩৫

۞ وَلَوۡ أَنَّنَا نَزَّلۡنَآ إِلَيۡهِمُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلۡمَوۡتَىٰ وَحَشَرۡنَا عَلَيۡهِمۡ كُلَّ شَيۡءٖ قُبُلٗا مَّا كَانُواْ لِيُؤۡمِنُوٓاْ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَهُمۡ يَجۡهَلُونَ

আমি যদি তাদের কাছে ফেরেস্তাদেরকে অবতারণ করতাম এবং তাদের সাথে মৃতরা কথাবার্তা বলত এবং আমি সব বস্তুকে তাদের সামনে জীবিত করে দিতাম, তথাপি তারা কখনও বিশ্বাস স্থাপনকারী নয়; কিন্তু যদি আল্লাহ্ চান। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুর্খ। ৩৬

وَلَوۡ فَتَحۡنَا عَلَيۡهِم بَابٗا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعۡرُجُونَ (١٤) لَقَالُوٓاْ إِنَّمَا سُكِّرَتۡ أَبۡصَٰرُنَا بَلۡ نَحۡنُ قَوۡمٞ مَّسۡحُورُونَ

যদি আমি ওদের সামনে আকাশের কোন দরজাও খুলে দেই আর তাতে ওরা দিনভর আরোহণও করতে থাকে। তবুও ওরা একথাই বলবে যে, আমাদের দৃষ্টির বিভ্রাট ঘটানো হয়েছে না বরং আমরা যাদুগ্রস্থ হয়ে পড়েছি। ৩৭

وَلَقَدۡ ذَرَأۡنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنسِۖ لَهُمۡ قُلُوبٞ لَّا يَفۡقَهُونَ بِهَا وَلَهُمۡ أَعۡيُنٞ لَّا يُبۡصِرُونَ بِهَا وَلَهُمۡ ءَاذَانٞ لَّا يَسۡمَعُونَ بِهَآۚ أُوْلَٰٓئِكَ كَٱلۡأَنۡعَٰمِ بَلۡ هُمۡ أَضَلُّۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡغَٰفِلُونَ

আর আমি সৃষ্টি করেছি দোযখের জন্য বহু জ্বিন ও মানুষ। তাদের অন্তর রয়েছে, তার দ্বারা বিবেচনা করে না, তাদের চোখ রয়েছে, তার দ্বারা দেখে না, আর তাদের কান রয়েছে, তার দ্বারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর। তারাই হল গাফেল, শৈথিল্যপরায়ণ। ৩৮

এইসব আয়াতে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্তকে অস্বীকার করে তারা সম্পুর্ণভাবে নির্জ্ঞানতায় বাস করে। তারা যেকোন ধরনের অসত্যকে মানতে রাজি আছে কিন্তু সত্যের ব্যাপারে থাকে অনড় একগুঁয়ে। তারা বৈজ্ঞানিক যুক্তিক ভাবনাকে না বিশ্বাস করতেই থাকে অগ্রগামী আর বিভ্রমকে করে অগ্রগণ্য আর এতেই তাদের প্রশান্তি। আদিম কাল থেকে বিবর্তন এর এই বিশ্বাস ঈশ্বর বিহীন মানসিকতার ফল স্বরূপ। সর্বপরি, এই মানসিকতা সব সময় থাকবে, আল্লাহ্‌র কিতাবেও এভাবে বলা আছে।

ডারউইনবাদি ধর্মকে আরো কাছ থেকে পর্যবেক্ষন

"... বছরের পর বছর ধরে মানুষ নানা ধরনের ব্যাপার নিয়ে বিভ্রম বা মায়ার পিছনে ছুটেছে এই ভাবনা আমার মধ্যে এক শীতল কাঁপুনি এনে দেয় আর আমি নিজেকে জিজ্ঞেস করি আমিও কি আমার জীবনটাকে এক খোশ খেয়ালে বা উদ্ভট ভাবনায় পার করলাম"।

(চার্লস ডারউইন এর চিঠি সি লিয়েল – C. Lyell কে লেখা, নভেম্বর ২৩, ১৮৫৯, উল্লেখ – ফ্রান্সিস ডারউইন, চার্লস ডারউইন এর জীবন এবং চিঠি – The Life and Letters of Charles Darwin, vol. II, নিউ ইয়র্ক; D. Appleton and Company, 1888, p. 25,)

ডারউইনবাদী ধর্মকে বুঝতে হলে, প্রথমেই যেটা প্রয়োজন সেটা হোল পুর্বকল্পিত বদ্ধমূল ধারনাগুলোকে মন থেকে অপসারণ করতে হবে। এপর্যুন্ত পাঠক যেটা পড়েছেন তা আসল গুণাবলী এবং এই ধর্মের উদ্দেশ্য গুলোকে তুলে ধরে নাই, শুধুই ঐ ধারণাগুলো যেসব মানুষকে প্রভাবিত করেছে। ডারউইনবাদকে উপাস্থপন করা হয় বিবর্তনবাদীদের মাধ্যমে এইভাবে যে এটা একটি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত প্রমানিত সত্য যা চার্লস ডারউইন কর্তৃক প্রণীত হয়েছে; যাহাইহোক, বিজ্ঞান অতি সম্প্রতি ডারউইনবাদের দাবিগুলোকে এক এক করে খণ্ডন করে বাতিল করে দিয়েছে। [৩৯] যেহেতু বিবর্তন তত্বের আর কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই, এটা এখন শুধুই বিভিন্ন রকম প্রচার এর উপর নির্ভর করছে আর বিবর্তনবাদীরা মনে করছে এখনও সমসাময়িক মানুষদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সত্য হিসেবেই আরোপ করা গেছে। আর ডারউইনবাদের প্রতিটি বিষয়কে জানতে প্রথমেই যেটা দরকার সেটা হোল বিবর্তনবাদের প্রচার এর প্রভাব থেকে বের হয়ে এসে সত্যকে উদ্ঘাটন কর।

চার্লস ডারউইনঃ একটি ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা

বিবর্তনের উল্লেখে প্রথমেই যে নামটি মনে আসে সেটা হোল চার্লস ডারউইন এর। যদিও প্রাণী জগতের বিবর্তনের মুল ধারণার উৎপত্তি প্রাচীন পৌত্তলিক কিছু ধর্ম, সেসবকে অমান্য করে বিবর্তনকে যিনি আজকের ধারণায় নিয়ে এসেছেন তিনি হচ্ছেন ডারউইন। যখন কেউ ডারউইনবাদী ধর্মের সন্মন্ধে জানতে থাকবে, ১৫০ বছর ধরে যে কল্পগাথা তৈরী হয়েছে ডারউইনকে ঘিরে সেটাকে সে কিভাবে পরাস্ত করতে পারবে সেটাই মুল। চার্লস ডারউইনকে বছরের পর বছর ধরে একজন মেধাবী, সফল বিজ্ঞানী এবং গবেষক হিসেবেই উপস্থাপন করা হয়েছে। আসলে বিবর্তনবাদীদের মধ্যে তাকে মনে রাখা হয় একজন

‘মহান বিজ্ঞানী’ এবং ‘শতাব্দীর প্রতিভা’ হিসেবে, মুলত এসব প্রচারণা ছাড়া কিছু নয়। যাহাইহোক, ডারউইনের জীবন বৃত্তান্ত এবং তাঁর ধারণা গুলি খুঁটিয়ে দেখলে এটা পরিস্কার হয়ে যায় যে বিষয়টা আলাদা।

ডারউইন, সবাই যেভাবে মনে করে বরং তাঁর উলটো, না তিনি ছিলেন গুরুত্বপুর্ন বিজ্ঞানী, না ‘প্রজাতির অধিকর্তা’ যিনি প্রকৃতির রহস্যকে উন্মোচন করেছেন। এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন একজন অ-বিশেষজ্ঞ যার ছিল খ্রিষ্ট ধর্মের শিক্ষা এবং যিনি চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যায়নে অকৃতকার্য্য হয়েছিলেন । তিনি ছিলেন একজন শৌখীন বা অপেশাদার গবেষক এবং আক্রান্ত ছিলেন অনেক ধরনের ব্যাধিতে যার অনেকগুলির লক্ষণ অ-আবিস্কৃত ছিল, তিনি ছিলেন মৌনশ্বভাবের এবং ত্বর্ককে পরিহার করে চলতেন, যার মনের মধ্যে ছিল নানা রকম সন্দেহ এবং তাঁর ছিল যৌক্তিক চিন্তার সমস্যা, তিনি ছিলেন একাকী এবং এক বিহ্বল আধ্যাত্মিক । তাঁর কন্যার মৃত্যুতে তাঁর আবেগপ্রবন প্রতিক্রিয়ায় তিনি ঈশ্বর এবং ধর্মের বীরুদ্ধাচারন শুরু করেন। আর এইধরনের অসুস্থ্য মানসিক এবং আধ্যাত্মিক অবস্থায় তিনি তাঁর তত্ব উপস্থাপন করেন যা পরে পরিগনিত হয় ‘নিরীশ্বরবাদের বুনিয়াদ’ হিশেবে।

ডারউইন প্রথম এই তত্বের মুল বিষয় নিয়ে পরিচিত গণ্ডির গুরুত্বপুর্ন কিছু বিজ্ঞানীর সঙ্গে কথাবর্তা, প্রবন্ধ এবং ব্যক্তিগত পত্রের মাধ্যমে তাঁর প্রচার শুরু করেন। ডারউইন যে কাজগুলো অসম্পুর্ন রেখে যান, বা পর্যাপ্তভাবে বর্ননা করেন নাই সেসব তাঁর অনুসারীরা সম্পুর্ন করেন এবং তারা এই তত্বের পুর্ন ব্যাখ্যা দিতেই থাকেন।

ডারউইন এর ‘দি অরিজিন অব স্পেসিস’, এমনভাবে সন্মানিত হতে থাকে যে মনে হবে এটি একটি পবিত্র গ্রন্থ, আসলে তা মতানৈক্য ও অসঙ্গতিতে পুর্ন এবং সঙ্গতিহীন যুক্তি নির্ভর মুলত সম্ভাব্যতা এবং অনুমান এর উপরই সে সবের ভিত্তি। ডারউইন নিজেই তাঁর বইকে যতখানি না বৈজ্ঞানিক উপকরন হিশেবে মনে করতেন তাঁর থেকে একে ‘এক লম্বা যুক্তির – a long argument’ সমাহার মনে করতেন। ডারউইন তাঁর বন্ধুদের কাছে লিখিত পত্রাদিতে স্বীকার করেন দুর্বলতাগুলো, অসঙ্গতি, সঙ্কট এবং সমস্যাগুলো তাঁর তত্বের মধ্যে। এমনি একটি চিঠিতে তিনি স্বীকার করেন যে তাঁর তত্বের মধ্যে আছে ভীষন ত্রুটি যা তাঁকে এমনকি আত্ম হত্যা করার অবস্থায় পর্যুন্ত নিয়ে যায়ঃ

তুমি আমার বইএর সন্মন্ধে জিজ্ঞেস করেছ আর এ নিয়ে যা আমি বলতে পারি যে আমি আত্মহত্যার জন্য প্রস্তুত; ভেবেছিলাম সুন্দরভাবেই লিখেছি কিন্তু দেখছি প্রচুর কিছুই পুনর্লেখনের প্রয়োজন ... [৪০]

অন্য আর একটি চিঠিতে তিনি লিখেনঃ

আশা করি তুমি ভাবছনা আমি এত অন্ধ হয়ে গেছি যে আমার ধারণার মধ্যে অনেক কঠিন সমস্যা গুলো আমি দেখতে পারছি না। [৪১]

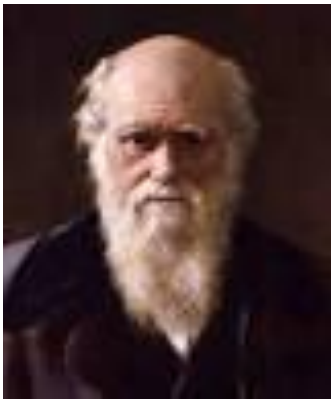

বিশেষ করে তাঁর বন্ধু, চার্লস লীএল – Charles Lyell এর কাছে লিখা চিঠিতে তিনি পরিস্কার ভাবে তাঁর সন্দেহ প্রকাশ করেন তাঁর তত্ব সন্মন্ধেঃ *বছরের পর বছর ধরে মানুষ নানা ধরনের ব্যাপার নিয়ে বিভ্রম বা মায়ার পিছনে ছুটছে, প্রায়শই এই ভাবনা আমার মধ্যে এক শীতল কাঁপুনি এনে দেয় আর আমি নিজেকে জিজ্ঞেস করি আমিও কি আমার জীবনটাকে এক খোশ খেয়ালে বা উদ্ভট ভাবনায় পার করলাম।* [৪২]

উপরন্তু, ডারউইন তাঁর ভুলগুলো এবং ভিত্তিহীন দাবি গুলো সন্মন্ধে স্বচেতন ছিলেন। তিনি লিখেনঃ *আমার কাজের এই ভাগে আসার অনেক আগেই, আমার পাঠকদের মধ্যে অনেকগুলো সমস্যা দেখা দেবে। এরমধ্যে*

কিছু কিছু এমনই ভয়ানক যে আমি সেসব ভাবতেই টাল খেয়ে যাচ্ছি। [৪৩]

তাঁর ঘনিষ্ট বন্ধু, আসা গ্রে'র – Asa Gray কাছে লিখিত এক পত্রে তিনি তাঁর তত্বকে উল্লেখ করেন বিজ্ঞান বহির্ভুত জল্পনা হিসেবেঃ *'আমি বেশ সচেতন যে আমার জল্পনাগুলো সত্যিকার বিজ্ঞানের গন্ডির অনেক বাহিরে।'* [৪৪]

Charles Lyell

পরের দিকের কিছু বিজ্ঞানীও ডারুইনের সামঞ্জস্যহীন আধ্যাত্মিকতা এবং ভিত্তিহীন যুক্তির উল্লেখ করেন। সত্য হোল যে তত্বকে পরম বাস্তবতা হিসেবে দুনিয়ার সামনে উপস্থাপন করেন তার প্রতিষ্ঠাতার মন ছিল নানা বৈপরিত্যে এবং সন্দেহে ভরপুর আর যা জন্ম দেয় এই তত্বের ভিত্তিমুল নিয়ে গুরুতর আশংকার। আমেরিকার পদার্থ বিজ্ঞানী ডারউইনের ভীতি নিয়ে একথা বলেনঃ *ডারউইনের দি অরিজিন অব স্পেসিস পড়ে আমি দেখলাম ডারউইন নিজেই খুব নিশ্চিত না যেভাবে তার সন্মন্ধে বলা হচ্ছে; বিশেষ করে 'ডিফিকাল্টিজ অব দা থিওরী' এই অনুচ্ছেদে তার নিজের সন্দেহগুলো রীতিমতো প্রকাশ পেয়েছে। একজন পদার্থ বিজ্ঞানী হিসেবে, আমি বিশেষ করে বিহ্বল হয়েছি তার এই মন্তব্যে যে তাহলে চোখের কিভাবে উদ্ভব হোল।* [৪৫]

Asa Gray

ডারউইন কিভাবে তাহলে এই 'এক খোশখেয়াল' এর প্রমে পড়ল? শিশু কালের এক বিরাট সময় ধরে তার হয়েছে ধর্মিয় শিক্ষা যা তাকে দিয়েছে জ্ঞান –বিশ্বাস, মতবাদ এবং প্রাচীন সভ্যতার ধর্মিয় ইতিহাস। আবার অন্য দিকে, তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন যখন তিনি বাস করছিলেন সেই শতাব্দীর প্রত্যক্ষ্যবাদী, বস্তুবাদী চিন্তাধারায়। বিশেষ করে, তার পিতামহ – এরাসমুস ডারউইন, যার ছিল ধর্ম বিরোধী ধ্যান ধারনা যা তাঁকে সম্পুর্নভাবে প্রভাবিত করে।

এরাসমুস ডারউইন এর 'প্রকৃতির মন্দির'

ঈরাসমুস ডারউইন

কিশোর ডারউইন তার দাদা - এরাসমুস এর থেকে শুনতেন ছোটবেলা থেকেই।[৪৬] আসলে, এরাসমুস ডারউইনই প্রথম বিবর্তনের ধারনা প্রস্তাব করেন বিলেতে। তার পরিচয় ছিল একজন পদার্থবিদ, মনোবিজ্ঞানী এবং একজন কবি হিসেবে আর তাঁর ছিল যথেষ্ট প্রভাব, যদিও তিনি ব্যক্তিগতভাবে কলুষ জীবনের অধিকারী ছিলেন এবং কমপক্ষে তার দুইজন জারজ সন্তান ছিল ।[৪৭] কিন্তু ইংল্যান্ডে এরাসমুস ডারউইন ছিলেন একজন সুপরিচিত প্রকৃতি বিজ্ঞানীদের একজন । প্রকৃতিবাদীরা বিশ্বাস করে এই বিশ্বলোকের সবকিছুর মুলেই হল প্রকৃতি আর এর আছে সৃষ্টি করার ক্ষমতা। যদিও এই মতাবাদের মূলধারা এসেছে প্রাচীন গ্রীক এবং সুমেরিয়ান কল্পলোকের প্রকৃতিবাদী দর্শন থেকে । আর ১৯ শতাব্দীতে এর মুল প্রবক্তাই ছিল ম্যাসোনিক সংস্থা। আর এই সত্যটি নিশ্চিত করেন ১৮৮৪ সালে পোপ ত্রয়োদশ লীও, পৃথিবীতে ক্যাথলিকদের ধর্মগুরু, তার বহুল প্রচারিত Humanum Genus – (The Human Race - মানব সম্প্রদায়), যা বিশেষ করে এই ম্যাসনদের উদ্দেশ্যেই লিখিত হয়ঃ

এই সময়ে, যাহাইহোক, বিভক্ত অপশক্তিরা মনে হচ্ছে একত্রিত হচ্ছে সন্মিলিত শক্তির প্রচন্ডতা দিয়ে লড়াই এর জন্য। আর এটাকে নেতৃত্ত দিচ্ছে অথবা সাহায্য করছে শক্তিশালী এবং বহু বিস্তৃত সংস্থা যার নাম ফ্রীম্যাসন্স। তারা এখন আর তাদের উদ্দেশ্য নিয়ে কোন রাখ ঢাক করছে না, প্রকাশ্যে তারা স্বয়ং ঈশ্বর এর বীরুদ্ধে জেগে উঠেছে।

পোপ এই সংস্থা এবং প্রকৃতিবাদীদের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে আরো উল্লেখ করেনঃ

আর এজন্যই, আমরা এর আগে পরিষ্কারভাবে দেখিয়েছি যে তাদের চুড়ান্ত উদ্দেশ্য নিজে নিজেই প্রকাশ পেয়েছে – যেমন, ধর্মিয় এবং রাজনৈতিক যে বিশ্ব

ব্যবস্থা খৃষ্টান শিক্ষা থেকে তৈরী হয়েছে সেটাকে তারা উলটিয়ে দিতে চায় আর এর বিকল্প হিসেবে যে নুতন রাষ্ট্র তারা কায়েম করতে চায় তাদের মতবাদে যার আইনকানুনের ভিত্তিই তৈরী হবে এই প্রকৃতিবাদ থেকে। [৪৮]

আর ম্যাসন্স, যারা প্রকৃতিবাদকে আত্মস্থ করেছে সেটার বিশাল প্রতিনিধিত্বই এসেছে ঈরাসমুস ডারউইনের থেকে, যিনি স্কটল্যান্ডের এডিনবারার ক্যাননগেট কিলউইনিং ম্যাসন্সদের প্রাসাদের- Canongate Kilwinning Masonic lodge, একজন অধিকর্তা ছিলেন। [৪৯] এর বাইরেও, এটা মনে হয় যে তিনি কোন ভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন ফ্রান্সের জ্যাকোবিন ক্লাবের – Jacobin clubs সাথে, অথবা ইলুমিনাটি'র – Illuminati সাথে যা সংযুক্ত ছিল ফ্রান্সের কিছু ম্যাসোনিকদের সঙ্গে কোন পর্যায়ে, যাদের প্রধান কাজই ছিল ধর্মকে প্রতিরোধ করা বা এর বীরুদ্ধে দাঁড়ানো।[৫০] ঈরাসমুস তার ছেলে রবার্ট ডারউইনকে (চার্লস ডারউইনের পিতা) তার মত করে তৈরী করার দীক্ষা দেন এবং তাঁকে ম্যাসোনিক সংস্থার সদস্য করে দেন। [৫১] সুতরাং চার্লস ডারউইন ম্যাসনিক মতবাদ তার পিতা এবং পিতামহের কাছ থেকে উত্তারাধিকার হিসেবেই পেয়েছিলেন।

ডারউইন এর তত্বের মুল বিষয়টা, আসলে, তাঁর পিতামহই ঠিক করেছিলেন যার প্রকৃতির উপর কাজগুলিই তাঁকে পথ দেখায়। ঈরাসমুস ডারউইন ডারউইনবাদের মুল বিতর্কগুলো তৈরী করেন এবং যা তিনি তাঁর বই দি টেম্পল অব নেচার – The Temple of Nature, ও যুনমিয়া – Zoonomia তে বিশদভাবে বর্ননা করেন। প্রকৃতির সৃষ্টির ক্ষমতা আছে এই প্রাচীন পৌত্তলিকদের বিশ্বাসকেই তিনি নবায়ন করেন। ১৭৮৪ সালে একটি প্রতিষ্ঠান এইধরনের বিষয়গুলোকে প্রচার করার জন্যই স্থাপিত হয় – দি ফিলসফিকাল সোসাইটি - The Philosophical Society – যা, কয়েক দশক পরে, একটি বৃহৎ এবং অতি আগ্রহী প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে চার্লস ডারউইন এর মতবাদের পৃষ্ঠপোষক হিশেবে। [৫২] ডারউইন এর বিবর্তনবাদের উপর নিজস্ব তত্ব অবশ্য প্রথম প্রস্তাবিত হয় গ্যালাপাগস দ্বীপে – Galapagos Islands.

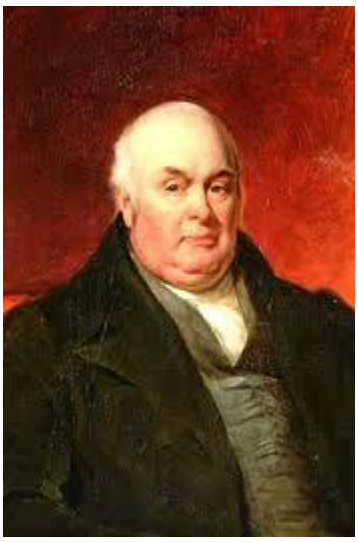

এক অন্ধকার ধর্ম জীবন পায় গ্যালাপাগস দ্বীপে

কল্পনা করুন সমুদ্রের মাঝখানে এক স্পন্দনশীল সবুজ দ্বীপ মালায় ভ্রমণের। আর এই স্বল্প একটু যায়গা মুল ভুখন্ড থেকে যা প্রায় হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে অবস্থিত, আর সেখানে রয়েছে সুন্দর, বহু জাতীয় উদ্ভিদ এবং প্রানী যা পৃথিবীর কোথায়ও পাওয়া

বিগল যে জাহাজে করে ডারউইন তাঁর ভ্রমন সম্পন্ন করেন।

যায় না। অনেক প্রানী, অনেক প্রজাতির কেউ যা অন্য কোথাও এই প্রাচুর্যতায় দেখতে পাবে না। আর আপনি যদি নিজেকে এইরকম এক যায়গায় আবিস্কার করেন, সামনে মনোমুগ্ধকর ছবি তখন কি মনে হবে আপনার?

আর এমন বিস্ময়কর রঙের সমাহার, পরিপুর্ন প্রাণবন্ততা এবং বৈচিত্র চোখের সামনে, নিঃসন্দেহে আপনি গভীর এক ভাবনায় আপ্লুত হয়ে নিজেকে জিজ্ঞেস করবেন এমনসব অপরূপ জিনিস কিভাবে, কোথা থেকে আসল। আপনি মনে করবেন সমুদ্রের মাঝখানে এমন একটি ছোট্ট ভুমি খন্ডে সৃষ্টির এক বিশাল এবং বিচিত্র শৈল্পিক উপস্থাপন যার সবকিছুই অসাধারন সৃষ্টির এক অংশ।

যাই হোক, যখন ডারউইন বিস্ময়কর এতসব প্রজাতি প্রকৃতিতে দেখতে পেলেন তিনি বেশীরভাগ মানুষ যেভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করত সেভাবে না করে বরং সিদ্ধান্তে আসলেন যে সব জীব পৃথিবীতে এসেছে দৈব খটনায় বা কাকতালীয় এক সামঞ্জস্যে। তিনি মনে করেন নাই যে এর সবকিছুই সেই চিরন্তন শক্তি আল্লাহ্‌র সৃষ্টি; ডারউইন এর যুক্তিবাদ তাঁকে উল্টো দিকে পরিচালিত করেছে।

গালাপাগস দ্বীপ যেখানে ডারউইন তাঁর তত্বের উপর কাজ করেন।

ডারউইন প্রচুর জীব বা প্রাণীর সন্মুখীন হন তাঁর ৫ বছরের এই যাত্রায় যা পাশ্চেত্যের বেশীরভাগ লোকই কখনো দেখেনি, বিশেষ করে এই গালাপাগস দ্বীপে তিনি যা দেখেন। আর এই দ্বীপ হচ্ছে অসংখ্য প্রজাতির প্রাণীর বাসস্থান যা একজন বিজ্ঞানী গবেষনা করতে পারেন। তিনি তাঁর যাত্রা পথে (যদিও তিনি হাজার হাজার জীব সংগ্রহ করেছেন, যেগুলো তিনি এলকোহল এর মধ্যে সংরক্ষণ করতেন) খুবই মনোযোগ দিয়েছিলেন বিভিন্ন ধরনের ফিঙ্গে'র (বিশেষ গায়ক পাখী) প্রতি। এদের সবার ঠোঁটের মধ্যে পার্থক্যগুলো তিনি অবলোকন করেন আর এখান থেকেই তাঁর মতবাদ বিকশিত হতে শুরু করে।

ডারউইন প্রস্তাব করেন যে ফিঙ্গের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ঠোটই হচ্ছে প্রকৃতির নিজস্ব নির্বাচনের প্রমান। কিন্তু অধুনা বিজ্ঞান দেখিয়েছে যে এটা প্রজাতির মধ্যে ভিন্নতা বৈ অন্য কিছু নয়। এটা বিবর্তনবাদের প্রমান বহন করে না।

ডারউইন সত্যিই যেটা করেছেন সেটা হোল নির্দিষ্ট কিছু পর্যালোচনার অতিরঞ্জন জল্পনা। এটা সত্যি যে ফিঙ্গে দের মধ্যে একটা বিশাল বৈচিত্র আছে যতখানি এই বংশানুক্রম অনুমিত করতে পারে। তাঁর মানে এই নয় যে ফিঙ্গেরা অন্য প্রজাতি থেকে বিবর্তিত হয়ে এসেছে অথবা এদের থেকে অন্য প্রজাতি বেরিয়ে আসতে পেরেছে। আধুনিক বিবর্তনবাদীরা স্বীকার করেছেন বা মেনে নিয়েছেন ফিঙ্গের ঠোটের বৈচিত্র নিয়ে ডারউইনের যে দাবী তা অতিরঞ্জিত অবৈজ্ঞানিক অনুমান। [৫৩]

অবশ্যই, কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি ফিঙ্গের ঠোটের বৈচিত্রের উপর ভিত্তি করে সমস্ত প্রাণীর উৎসের এই মতামতকে মেনে নিতে পারে না। এটা কিভাবে- বিশাল তিমি মাছের উদ্ভব, হাতি যাদের রয়েছে নিজস্ব সুনিদৃষ্ট বৈশিষ্ট, মাছি যাদের রয়েছে বিস্ময়কর নিপুনতা, প্রজাপতিদের ডানার চমৎকার সামঞ্জস্য, বিশাল রকমারি মাছের প্রজাতি, কাঁকড়া, পাখি, সরীসৃপ এবং বিশেষ করে বুদ্ধিমত্তা এবং আত্মজ্ঞান সম্পন্ন মানুষ, এসবের উদ্ভবের সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত করে?

একজন সত্যিকারের বিজ্ঞানী যখন প্রানী নিয়ে অনুসন্ধান করে, বৈচিত্রই একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হতে পারে না। বরং, এটা প্রতিয়মান যে অনেক বেশী গুরুত্বপুর্ন ঘটনার মুলে হোল অসাধারণ এক অবয়ব এবং গঠনশৈলী যা পাওয়া যায় এইসব জীবে। ফিঙ্গের আলোচনায়, তাঁকে বিবেচনা করতে হবে তার নির্ভুল উড়বার কৌশল, এক অদ্ভুদ ভাবে তৈরী পাখনা এবং নিখুঁত প্রযুক্তি, এইসব। তাঁকে বিশ্লেষণ করতে হবে একেকটি পাখার বায়ুগতিবিদ্যা শৈলী, এর সুকৌশলে কৃত নমনীয় গঠন যা পাখীকে উড়ায়, আর লাখ লাখ ছোট ছোট আঁকড়া যেসব এদেরকে একত্রে গেঁথে রাখে। একজন বিজ্ঞানী যার মধ্যে মুক্ত বুদ্ধি এবং উদার চেতনা বিদ্যমান, যে কোন পুর্বপরিকল্পিত ধারনা ধারন করে নাই, দেখতে পাবে এক অতি সাধারন এবং চাক্ষুষ সত্য; এই নিখুঁত নকশা, অপ্রতিদ্বন্দ্বি সৌন্দর্য্য আর এর অসংখ্য প্রজাতি শুধু সৃষ্টিকর্তাই সৃষ্টি হতে পারে।

যে কারনে ডারউইন এবং তাঁর অনুসারীরা এই সত্যকে রেখেছে অগোচরে তা হোল বস্তুবাদী দর্শনে তাদের মনস্তাত্ত্বিক সংশ্লিষ্টতা,

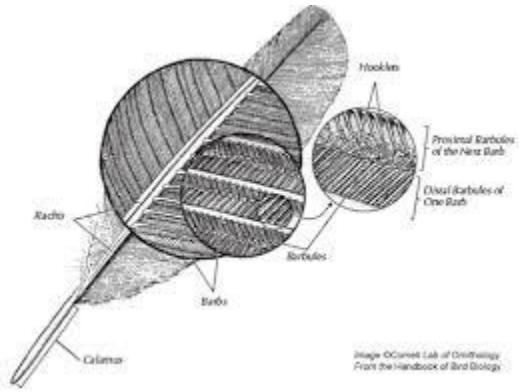

ডারউইন এর এই আধ্যাত্মিক অবস্থান খুবই পরিষ্কার। তাঁর চক্ষু এবং ময়ুরের পাখার কাঠামোর বর্ণনা তার সুন্দর উদাহরণঃ

আমার সময়টা বেশ মনে আছে যখন চক্ষু নিয়ে আমার ভাবনা কিভাবে আমাকে পুরোপুরি শীতল করে দিয়েছিল, কিন্তু আমি এই বিলাপের অবস্থা থেকে নিজেকে উদ্ধার করেছি এবং সামান্য ও তুচ্ছ গঠন প্রনালীগুলো আমাকে প্রায়শই বেশ অস্বস্তি দেয়। ময়ূর পুচ্ছের পেখমের দৃশ্য, যখনিই আমি তা অবলোকন করি আমাকে সেটা অসুস্থ করে তোলে! [৫৪]

এটা অবশ্যই ডারউইনের কুসংস্কারগ্রস্থতারই বহিঃপ্রকাশ সেই ক্ষেত্রে যখনিই তিনি প্রকৃতির এই বিষয়গুলির সন্মুক্ষিণ হন। এর কারন যে বিশাল বৈচিত্রের জীবন্ত প্রাণী তিনি গ্যালাপাগস দ্বীপে পর্যবেক্ষন করেছেন, তিনি সেসবকে এলকোহলের মধ্যে সংরক্ষণ করেই সন্তুষ্ট ছিলেন এবং এসবের মধ্যে যে অসাধারণ গুণাবলীগুলি তিনি পর্যবেক্ষন করেছেন সেসব নিয়ে ভাবনা চিন্তা তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। এরপরেও, কাউকে গালাপাগস দ্বীপ মালায় গিয়ে এইসব বৈশিষ্টময় সৃষ্টির প্রমান খুঁজতে হবে না যা গোটা দুনিয়ায় রয়েছে। শুধু আকাশের দিকে তাকিয়ে অবলোকন করলেই সে দেখতে পারবে অসংখ্য প্রমান আল্লাহ্‌র অস্তিত্তের, শক্তির, বিজ্ঞতা এবং বুদ্ধিমত্তার।

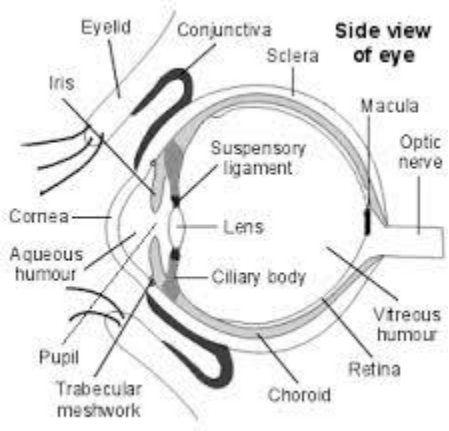

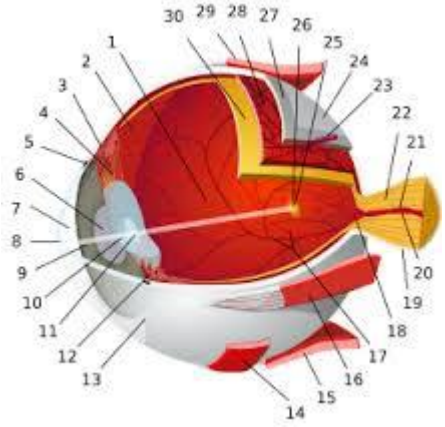

চক্ষু, যার ভাবনা একদা ডারউইনকে সম্পুর্নভাবে শীতল করেছিল, অগুনতি প্রমানের মধ্যে এটি একটি। চোখের গঠন কাঠামো যা অনেক বেশী জটিল এবং নিখুঁত তা কি কাকতালীয় বা দৈবক্রমে তৈরী হতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে ৪০ টির বেশী ভিন্ন রকম অঙ্গ; এসবের মধ্যে আসল এবং গুরুত্বপুর্ন হোল এর জটিলতা যাকে কক্ষনই সরলীকরণ করে ছোট বা সাধারন করা যাবে না। এর মানে চোখ যখন কাজ করে তখন এর ৪০টি অঙ্গের সবগুলিকেই এক সঙ্গে স্বক্রিয় হতে হবে। এর একটি অঙ্গের বিকলতায় বা অসম্পুর্নতায় পুরো চোখই হয়ে যাবে বেকার বা নিস্কৃয়। এছাড়াও, এই ৪০টির প্রতিটি অংশের রয়েছে

নিজস্ব জটিল নির্মান শৈলী। উদাহরণ স্বরূপ, অক্ষিপট- retina – চোখের মণির পিছনের আলোকসংবেদী পর্দা, যার মধ্যে রয়েছে ১১ টি ভিন্ন স্তর আর যার মধ্যে একটি হচ্ছে রক্তবাহী জাল-web of blood vessels এই স্তরটি, যা কিনা শরীরের সবচেয়ে ঘন রক্তবাহী স্থান, আর তা সরবরাহ করে অক্সিজেন যার মাধ্যমে অক্ষিপটের, কোষগুলি আলোকে রুপান্তর বা ব্যাখ্যা করে। অন্যান্ন প্রত্যেকটি স্তরের রয়েছে নিজস্ব কর্ম ক্রিয়া। কোন বিবর্তনবাদীই প্রত্যয়জনক উত্তর দিতে পারবে না এই প্রশ্নের- কিভাবে এত জটিল অঙ্গের উদ্ভব হয়েছে, আর এটাই হোল আল্লাহ্‌র নিখুঁত সৃষ্টির একটি লক্ষণ। আল্লাহ তায়ালা মহান কুরআনে বলেছেনঃ

هُوَ ٱللَّهُ ٱلۡخَـٰلِقُ ٱلۡبَارِئُ ٱلۡمُصَوِّرُ لَهُ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰۚ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ (٢٤)

"তিনিই আল্লাহ তায়ালা, শ্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, উত্তম নাম সমুহ তাঁরই। নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবাই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়।" [৫৫]

যারা অন্ধভাবে নিজেকে উৎসর্গ করে ডারউইনের অনুসারী হিশেবে আর ঘোষণা করে যে তিনি হলেন 'প্রজাতিদের নৃপতি'-lord of species এ পর্যুন্ত তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট সন্মন্ধে যা কিছু বলা হয়েছে তা অবশ্যই হিশেবে নেবেন। তাদেরকে অবশ্যই দেখতে হবে যে ডারউইন এর তত্ব এক পরী কাহিনী নির্ভর 'প্রকৃতির মন্দির –Temple of Nature' সন্মন্ধে যা তিনি তাঁর দাদার কাছ থেকে শুনেছিলেন, সেটার উপর ভিত্তি করে, জীব বিজ্ঞানের উপর অপেশাদার জ্ঞান থেকেই ভ্রান্ত এই অনুমান মুলত এসেছে, যা হচ্ছে কল্পনা প্রসুত ভ্রান্ত অনুমান ও চরম বিদ্বেষ বা সৃষ্টির বীরুদ্ধে পক্ষপাত মূলক এবং উনবিংশ শতাব্দীর ভাসা ভাসা এক সংস্কার যা বিশ্বাস করে নাস্তিকতা হোল বিজ্ঞান। আদিম পৌত্তলিক কুসংস্কার থেকে সংগৃহীত এর প্রেক্ষাপট যা হচ্ছে অমুলক বিশ্বাস, যার পরিচিতি এসেছে এরিস্টটল প্রণীত 'স্কালা ন্যাচার' এর প্রস্তাবনা থেকে শত শত বছর আগে।

এই অমুলক ধর্মের একগুয়ে সমর্থনের একমাত্র কারন হোল এটিকে ব্যাবহার করা হয় অস্ত্র হিশেবে সত্যিকারের ধর্মের বীরুদ্ধে, সেটা হোল, আল্লাহর উপর বিশ্বাস। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিলিপ ই জনসন – Phillip E. Johnson, বিবর্তনবাদের তত্বের বিরোধিতা সত্যেও যিনি পন্ডিতদের মধ্যে একটি শ্রদ্ধাময় অবস্থান করে নিয়েছিলেন, তিনি বিশ্লেষণ করেনঃ

> সংক্ষেপে, ডারউইন বাদ মুলত ঈশ্বরকেই তিরোহিতের (ঈশ্বর এর উপর বিশ্বাস) মানে বুঝায় এবং যায়গা আয়োজন করে তাঁর প্রতিস্থাপনের ..... ধর্মকে একটি নুতন বিশ্বাস দিয়ে যার গোড়ায় রয়েছে ক্রমবিকাশ সন্মন্ধিয় প্রকৃতিবাদ। [৫৬]

অন্য আর এক বই এ জনসন ডারউইনবাদের এই দিকটার এইভাবে বর্ননা করেনঃ

> পক্ষপাত হোল এক বিরাট সমস্যা, যাহাইহোক, যেহেতু বিজ্ঞানের পুরোধারা নিজেদেরকে ধর্মীয় মূলনীতি বাদিদের বীরুদ্ধের দুর্দান্ত লড়াইয়ের পক্ষ নিয়েছেন, যাদের সব্বাইকে তারা এই একই ভাবে আখ্যা দেয়ার প্রবণতায় নিবিষ্ট থাকে যারা সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী এবং যারা দুনিয়ার ব্যাপারগুলো নিয়েও সক্রিয় থাকেন। এই মুলনীতিবাদীদের দেখা হয় উদার স্বাধীনতার জন্য হুমকি স্বরূপ, আর বিশেষ করে বিজ্ঞানের গবেষনায় সাধারন মানুষের সমর্থনের জন্য হুমকি মুলক। বৈজ্ঞানিক প্রকৃতিবাদের যে শ্রুতি সৃষ্টির ব্যাপারে, ডারউইনবাদীরা মৌলবাদীদের বিরুদ্ধের লড়াইয়ে অপরিহার্য্য এক নৈতিক ভুমিকা পালন করে। আর এই কারণেই, বৈজ্ঞানিক সংস্থাগুলি ডারউইনবাদ রক্ষার জন্য উৎসর্গিত, একে আরও পরীক্ষার জন্য নয়, আর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান বা তদন্তের নীতিমালাও এই ধাচে গড়ে উঠানো হয়েছে তাদের সফলতার আনুকুল্লে। [৫৭]

ফিলিপ ই জনসন যেইভাবে উল্লেখ করেছেন, বস্তুবাদী দর্শন তাদের পক্ষে বিবর্তনবাদের তত্বকে সাহায্যকারী হিশেবে পেয়েছে এবং ধর্মের বীরুদ্ধের প্রচারকরা শক্তি নেয় ডারউইন বাদ থেকে। সেইহেতু, ধর্ম বিরোধীরা ডারউইনবাদের অগ্রগতিকে তাদের বিশেষ লক্ষ্যে পরিণত করেছে এবং ডারউইনবাদের উল্লেখযোগ্য প্রবক্তারা হচ্ছে ধর্মের এবং এর যারা অনুসারী তাদের প্রতিপক্ষ।

দি অরিজিন অব স্পেসিস – The Origin of Species:

মেকী ধর্মের ভ্রান্ত গ্রন্থ

দি অরিজিন অব স্পেসিস গ্রন্থটি ডারউইনবাদীরা পবিত্র গ্রন্থ হিশেবে মনে করে এবং সেই সন্মানই দেয়। কিন্তু, আমরা আগেই যেভাবে দেখেছি, দি অরিজিন অব স্পেসিস হচ্ছে বিশাল এক অসামঞ্জস্যপুর্ন পর্যবেক্ষন, সন্দেহ এবং অনিশ্চিত বিষয়ে ভরা আর এটা হচ্ছে ডারউইন এর নেতিবাচক আধ্যাত্মিক অবস্থার ফলাফল। বইটি আসল বিজ্ঞানের কোন কাজ নয় বরং কেবল অনুমান নির্ভর; এমনকি চার্লস ডারউইনের নিজেরই ছিল গুরুতর অননুমোদন এর বৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট নিয়ে। তাঁর বন্ধু এল, ব্লমফিল্ড কে – L. Blomefield, এক চিঠিতে তিনি লিখেনঃ

দি অরিজিন অব স্পেসিস বইটির প্রকাশনার পর অনেক কিছুই প্রচারে এসেছে যা আমার মধ্যে যথেষ্ট সন্দেহ জাগায় যে আমি আমার মনোবল এবং শক্তি বজায় রেখে এইসব কিছুকে আত্মস্থ করে এর সারসংক্ষেপে আসতে পারব ..... [৫৮]

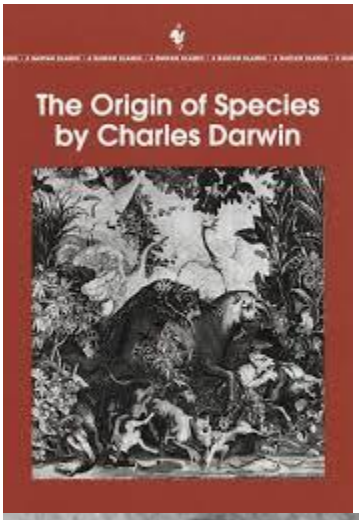

বইএর বিষয়বস্তু নিয়ে ডারউইনের এক ঘনিষ্ট বন্ধু এ, সেজউইক- A Sedgwick, প্রতিউত্তরে বলেনঃ

আমি তোমার বই পড়েছি আনন্দের চেয়ে বরং অনেক কষ্টে। কিছু অংশে আমি খুবই মুগ্ধ হয়েছি , আর অনেক ক্ষেত্রে আমি হেসেছি যতক্ষন পর্যুন্ত সেটা যন্ত্রনার কারন হয়েছে; অন্যান্ন অংশ পড়েছি খুবই আক্ষেপে কেননা আমি মনে করি সেসব জঘন্য মিথ্যা এবং গুরুত্বর অনিষ্টকর। তোমার অনেক সিদ্ধান্তই অনুমান নির্ভর যা প্রমাণ যেমন করা যাবে না আবার অপ্রমাণ করাও যাবে না। তুমি লিখেছ 'প্রকৃতির নির্বাচন' এটা এমন যেন এক উৎসাহী নির্বাচনী প্রতিনিধি এসব করেছে। [৫৯]

অসংখ্য ভুল নীতিমালার উপর নির্ভর, অযৌক্তিক কল্পনা এবং অসম্পুর্ন দাবী এতসব সত্বেও এই বই আজও সাধারনভাবে থেকে গেছে কোন ধরনের অভিযোগ বা আপত্তির বাইরে। এর মুল কারন হোল দি অরিজিন অব স্পেসিস বস্তুবাদী এবং নাস্তিকদের দর্শনের মুল ভিত্তির যোগান দেয়। এটাকে কাল্পনিক যুক্তিবাদী, বিপথগামী বিশ্বাসী এবং মেকী ধর্ম, সারা দুনিয়ার যাদের জীবন বস্তুবাদী ভাবনার উপর নির্ভরশীল তাদের রক্ষাকর্তা হিশেবে গৃহীত হয়ে আসছে। যদিও অনেকে এই বই পড়েও দেখেনি, অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এটাকে আধুনিক ভাবনার মুল সোপান হিশেবে মনে করে। জ্যাক বারযুন — Jack Barzun দি অরিজিন অব স্পেসিস এর গুরুত্বকে এইভাবে বর্ননা করেনঃ

এ সেজউইক

এটা পরিষ্কার যে, বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী উভয়েই প্রকৃতির নিজস্ব নির্বাচন এর ব্যাপারে ডারউইনএর গোঁড়া মতাদর্শ তৈরীর সফলতায় একমত, অসংখ্য বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং সমাজ সংস্কারকদের যা একত্রিত করেছে। ডারউইন হয়ে গেছেন দেবতা এবং দি অরিজিন অব স্পেসিস যাকে কেন্দ্র করে বিবর্তন দুনিয়াকে কাপিয়ে দিয়েছে''। [৬০]

ডারউইন এবং তাঁর বই যখন প্রচুর প্রশংসা পাচ্ছিল, হেনরি এম মরিস – Henry M Morris তাঁর বই ঈশ্বর এর বীরুদ্ধে দীর্ঘ্য যুদ্ধ – The Long War Against God, দেখিয়ে দেন যে The Origin of Species বিজ্ঞান থেকে কত দুরেঃ

আসলে, যে কেহ এই বই এ বিবর্তনের উপরে সত্যিকারের কোন বৈজ্ঞানিক প্রমান খুজবেন নিস্ফল ভাবে..... কোন প্রমানই কোথাও দেয়া হয় নাই – কোন উদাহরণও দেয়া হয়নি এমন কোন প্রজাতি যা প্রকৃতির নির্বাচন থেকে সৃষ্টি হয়েছে, বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে পার হচ্ছে এমন কোন প্রজাতিও দেখানো হয় নাই, বিবর্তনের কোন তথ্যও সংগৃহীত হয়নি। বস্তুতপক্ষে সমস্ত বইটিতেই উল্লেখযোগ্য ভাবে দলীল বা তথ্যের অভাব। সবটাই অনুমান বা ফটকাবাজী, বিশেষ আরজি অথবা প্রতিবাদ, অপরিকল্পিত কাপট্য। কোন কিছুরই উৎপত্তির কোন নজির বা যুক্তি আধুনিক বিশ্লেষণে ধোপে টেকে না, এমনকি অন্য বিবর্তনবাদীদের কাছেও। তবে কেহ বিস্ময় প্রকাশ করবেন যে এমন একটি বই মানব জীবনের চলমান ইতিহাসে এবং ভাবনায় একটি গভীর প্রভাব ফেলতে পারত। অবশ্যই এখানে যা দেখা যায় তার থেকেও বেশী কিছু আছে! [৬১]

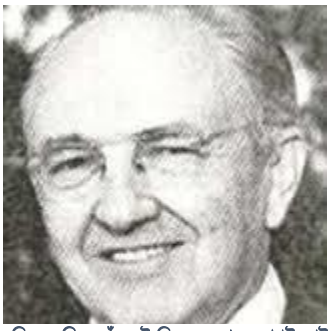

হেনরি ম মরিস তাঁর বই দি লং ওয়ার এগ্যাইনশট গড, বিবর্তনবাদীদের ধর্মের বিরুদ্ধে ভুলপথে পরিচালিত সংঘর্শের সমালোচনা করেন

হেনরি মরিস যেভাবে ভেবেছেন, দি অরিজিন অব স্পেসিস মানব ইতিহাসের উপর প্রভাবের বিভিন্ন রকম কারন রয়েছে। বিজ্ঞানের সার্বিক ইতিহাসে, কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণা হোক তা সঠিক অথবা বেঠিক, এত আবেগ আর অন্ধবিশ্বাসে গৃহিত হয় নাই। নিউটন বা আইনস্টাইনের দুনিয়া কাপানো বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনী কখনই বিজ্ঞানীদের

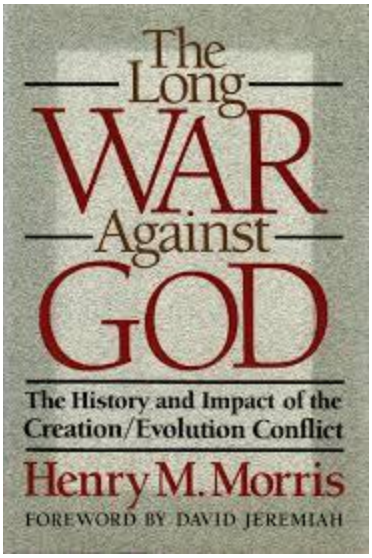

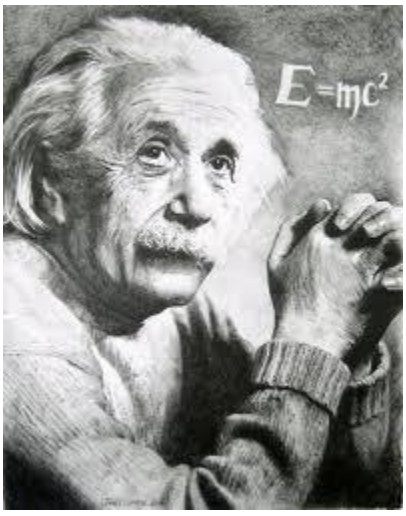

আলবার্ট আইনস্টাইন

আইজাক নিউটন

দুনিয়ায় এই রকম আগ্রহ নিয়ে অনুসারিত হয় নাই। এখানে কোন বৈজ্ঞানিক ধারণার মোকাবিলা করা হয় নাই, বরং একটি ধর্মের প্রসার ঘটানো হয়েছে অত্যন্ত শক্তিশালী উপদেশ বা পরামর্শে। আর ডারউইন হচ্ছে এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা, আর তিনি পয়দা করেছেন বিবর্তনের উপরে একটি 'পবিত্র' গ্রন্থের।

ডারউইন এর ধর্ম হচ্ছে একটি কুসংস্কারময় ধর্ম (Pagan Religion)

এক বিশাল জনগোষ্ঠী আল্লাহ প্রদত্ত ধর্মে বিশ্বাস করে। অনেকে বিশ্বাস করে ভ্রান্ত ধর্মে যা তাদের সমাজ তৈরী করে দিয়েছে; তারা উপাসনা করে টটেম'এর, প্রার্থনা করে সুর্য্যের কাছে, ইউ এফ ও'র কাছে সাহায্য চায়। এরাই প্যাগান বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিসেবে পরিচিত। এ পর্যুন্ত আমরা যা দেখিয়েছি, এতে এইভাবে বলা যায় বিবর্তনের তত্ব এইসব সংস্কারময় ধর্মের মতই যেখানে বহু ঈশ্বর এর উপাসনা করা হয়।

ডারউইন বাদের আসল দেবতা হোল 'coincidence, কাকতালীয়তা'। ডারউইনের যে কোন কিছু পড়লেই কেহ লক্ষ্য করবে এই দেবতার শক্তি, এর সামর্থ্য, অভিজ্ঞতা এবং দুরদর্শিতা কেননা ডারউইন এর অনুসারীরা বিশ্বাস করে যে এই বিশ্ব ভ্রমান্ড এবং যা কিছু এর মধ্যে আছে, জীব অথবা জড়, সব কিছুই অস্তিত্তে এসেছে বা সৃষ্টি হয়েছে দৈবক্রমে। এই প্রভুর নাম 'কাকতালীয়' এটাই সবকিছুর মুলে আর যা ডারউইনবাদের রক্ত সঞ্চালক। আর

যেটা হোল আগ্রহ উদ্দিপক কিছু ডারউইনবাদী যারা নিজেরা 'বৈজ্ঞানিক' এর লেবাস ধারন করে তারাও একই বস্তুর উপাসনার এবং মতবাদের গুণগান করে এই কুসংস্কারময় ধর্ম নিয়ে। যেমন, ফরাসী জীববিজ্ঞানী পিয়েরে পি গ্রাসে - Pierre P. Grasse, যিনি নিজে একজন কট্টর বিবর্তনবাদী, এই সত্যের উপর দৃষ্টি আকর্ষন করেনঃ *''ঘটনাচক্র হয়ে গেছে একধরণের ঈশ্বরের রক্ষাকবচ, যা, নাস্তিকদের আবর্তে পরিচিত না করেই যাকে প্রচ্ছন্নভাবে উপাসনা করা হচ্ছে''*। [৬২]

অন্য পৌত্তলিক ধর্মগুলিও একই দেবতার মুখাপেক্ষী হচ্ছে। গ্রীক, চীন এবং ভারতীয় ধর্মগুলিতে জীবন্ত বস্তুর আবির্ভাবকে বর্ননা করা হচ্ছে এই দৈব ঘটনার সঙ্গে। দজলা, ফোরাতের পাললিক ভুমিতে (মেসোপটেমিয়া) বেবিলনিয়, অ্যাসিরীয় সভ্যতায় বিভিন্ন দেব দেবীর পুজা করা হোত, পাথরের এই স্তুপগুলি থেকে সাহায্য প্রত্যাশা এবং প্রার্থনা করা হোত আর এটাও ভাবা হোত যে এসব মুর্তির মধ্যে রয়েছে মহাশক্তি। আর এইসব ধর্ম অনুযায়ী, হটাত করেই বা কাকতালীয়ভাবে জীবের উদ্ভব ঘটেছে। উদাহরণ স্বরূপ, একটি নদীর দুকুল ভেঙ্গে বন্যা বা অন্যান্ন প্রাকৃতিক ঘটনা। নুতন নুতন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা নুতন প্রজাতির জীবের আবির্ভাব ডারউইনবাদ অনুযায়ীও প্রকৃতির ব্যাপার, যেমন হটাত করে তাপমাত্রার পরিবর্তন অথবা উচ্চ মাত্রার বিকিরণ ইত্যাদি। যাহাইহোক, ডারউইনবাদের 'কাকতালীয়' ধারনা অন্যান্ন ঈশ্বরদের থেকে ভিন্ন; কেননা এটাকেই তারা তাদের কার্যবস্তু এবং লক্ষের কেন্দ্র বিন্দু মনে করে!

এটা বের হয়েছে যে, 'কাকতালীয়'র একটা অভীষ্ট লক্ষ আছে; এটা যথেচ্ছভাবে সংঘটিত কোন প্রক্রিয়াকেই আমলে নেয় নাই। এই বিগ্রহ এতই দুরদর্শী ছিল যে, একেবারেই ছোট্ট জীব বা জীবদেহ থেকে শুরু করে, এটা দুনিয়াতে প্রত্যেক জীবকে অস্তিত্তে এনেছে বা জীবন দিয়েছে এবং কোটি কোটি বছর আগেই এদের ভবিষ্যৎ প্রয়োজন এবং দরকারগুলোর পরিকল্পনা করে রেখেছে। এমনকি কোটি কোটি বছর পরে কি ঘটতে যাবে সেসবও তার জানা এবং প্রতিটি শুক্ষ্মাতি শুক্ষ্ম বিবরনের স্থান করে রেখেছেন যার মধ্যে কোন কিছুই বাদ যায়নি।

আর এইসব কিছুর ব্যবস্থাপনা করতে, 'কাকতালীয়' ঈশ্বর নানান পদ্ধতি ব্যবহার করেন; যার মধ্যে একটি হোল পরিবর্তন - mutation। পরিবর্তন বলতে এখানে রদবদল বা পুনর্গঠন অথবা ডিএনএ (DNA) অণুর পরিবর্তন (যা থাকে জিবকোষের অণুর মধ্যে, যা সংগৃহীত করে সৃষ্টি বা উদ্ভবের তথ্যগুলি – Genetic) বিকিরণ বা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার প্রভাবে। পরিবর্তন সাধারনভাবে নষ্ট বা ক্ষতির কারন হয় যা কোষগুলি মেরামত বা পুনর্গঠন করতে পারে না। উধাহরন স্বরূপ, মঙ্গোলজাতিয় অবয়ব, বামুনাকৃতি, সিকল সেল এনেমিয়া (রক্তের লোহিত কণিকার পরিবর্তন যা কাস্তের আকার ধারণ করে বলে একে সিকল সেল বলা হয়। এইসব কোষ রক্তের সঞ্চালনকে রোধ করে এবং অক্সিজেনের অভাব তৈরী করে) মানসিক এবং শারীরিক বিকলাঙ্গতা এবং ক্যানসার ব্যাধি এসবকে ক্ষয়িষ্ণু পরিবর্তন পদ্ধতির (mutation) উদাহরণ হিশেবে ধরা হয়। পরিবর্তন পদ্ধতি এমন কোন যাদু নয় যা উতকর্ষতা বা পুর্নাঙ্গতা তৈরী করে। পরিষ্কারভাবে এটা একটি ক্ষতিকর প্রক্রিয়া যা মৃত্যু, বিকলাঙ্গতা এবং অসুখ বা ব্যাধির কারণ। আর এই সত্যকে বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেছেন এইভাবে যে পরিবর্তন প্রক্রিয়া হচ্ছে ভূমিকম্প স্বরূপ। [৬৩]

পরিবর্তন এর প্রভাবটা সবসময়ই ঋণাত্মক; যাহাইহোক, 'কাকতালীয়' কি নিয়মতান্ত্রিক বা ইতিবাচক ফলদায়ক! আর এটা বিশ্বাস করা হয় যে এই ঈশ্বর সৌন্দর্যের সৃষ্টিকারী, নির্ভুল এবং চমৎকার ধারাবাহিকতায়। যেমন, মানুষের শরীরের মধ্যে ১০০ ট্রিলিয়ন কোষ তৈরী করতে পারে কোন রকম ত্রুটি বা খুঁত ছাড়াই। কিংবা যেমন কারখানায় তৈরী হচ্ছে কোষ, তৈরী হচ্ছে শক্তি বা বল, এনজাইম এবং হরমোন, তথ্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে নিউক্লিয়াসের তথ্য ভাণ্ডারের মধ্যে, কিধরনের তথ্য উৎপাদন বা তৈরী হচ্ছে, অথবা কিধরনের কাঁচামাল বা উৎপাদিত সামগ্রী সরবরাহ হচ্ছে কারখানার বিভিন্ন বিভাগের পরীক্ষাগার বা শোধনাগার প্রক্রিয়ায় যা বিশ্লেষণ করে যা কিছু বাহিরের থেকে প্রবেশ করছে আর এক ঝিল্লি বা পর্দা নিশ্চিত করছে যা কিছু নির্গত হচ্ছে সেসবের গুনাগুনের, এই ঈশ্বর কখনই ভুল করেন না আর তাঁর পরিকল্পনা কখনই বিকৃত হয় না।

আর এই ঈশ্বরের অতুলনীয় ক্ষমতার উধাহরন গুলো সংখ্যাতীত। যেমন, দৈব বা হটাত ঘটে যাওয়া জীবনকে করেছে নির্ভরশীল এর হৃদপিণ্ডের উপর এবং এর সঞ্চালন ব্যবস্থার উপর। আর এই হৃদপিণ্ডের সক্ষম কার্যক্রমের জন্য তৈরী হয়েছে ধমনীর যা সঞ্চালন করে রক্ত শরীরের প্রতিটি অঙ্গ প্রতঙ্গে; আর এইভাবে যখন কাজ চলে, ভুল হয়না ধমনীর ব্যবস্থায় এইসব রক্তকে হৃদপিন্ডে ফিরিয়ে আনতে। এরই মধ্যে, যকৃত যোগ হয়েছে এই ব্যবস্থায় রক্ত থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড নিস্কাসনের জন্য যা আবার পুরা ব্যবস্থাটাকে হৃদপিণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। এতে উপলব্ধি ছিল যে অন্যসকল অবিশুদ্ধ বা অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির পরিষ্কারের জন্য চাই কিডনি বা মূত্রাশয় আর সঙ্গে সঙ্গে তা তৈরী হয়ে গেল .....।

আর এই তালিকা প্রলম্বিত করা যায় অনায়াসে। যে কোন জীবের প্রান যাপনের জন্য, বিশাল সংখ্যার অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে নিখুঁতভাবে তাদের কার্য সম্পাদন করতে হয় পুর্ন তাৎক্ষণিক সমন্বয়ের মাধ্যমে। এমনকি যদি এর মধ্যে সামান্য একটি অঙ্গ বসে যায় বা ব্যর্থ হয় কার্য সম্পাদনে, জীবের মৃত্যু হয় অল্প সময়ের মধ্যে বা বেশী হলে ক'দিনের মধ্যে। কিন্তু বিবর্তনবাদীদের দাবী অনুযায়ী, ঈশ্বর, দৈবতা হোল উচ্চমানের সংবেদনশীল আর সচেতন, পরিকল্পনা হচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে তা বাস্তবায়িত হচ্ছে লক্ষ কোটি পুর্ন এবং নিখুঁৎ জীব। ইহা মানবেরও সৃষ্টি করেছেন লম্বা প্রক্রিয়ার ব্যবধানে। অথচ শুধু মানব সৃষ্টিতেই সন্তুষ্ট হয় নাই, এটাও ভাবা হয়েছে যা কিছু সম্ভাব্য প্রয়োজন তাদের এবং তাদের আগত বংশধরদের হাজার বছরের চাহিদার, গমকে তৈরী করা হয়েছে হাজার বছর আগে; পরবর্তি বংশধরদের শক্তি বা জ্বালানীর প্রয়োজনে তৈরী করেছে তেল। সুর্য্যকে শক্তির উৎস করা হয়েছে এরই সঙ্গে এর ক্ষতিকর রশ্মির প্রতিরক্ষার ব্যাপারটাও উপেক্ষা করা হয়নি, আকাশমন্ডলে তৈরী করা হয়েছে বিভিন্ন স্তরের আবরণ মানুষকে এর মারাত্মক ক্ষতিকর রশ্মি থেকে রক্ষা করার জন্য।

বিবর্তনবাদীরা দাবী করে যে আরাধিত দেবতা, দৈবতা, যার সামর্থ্য আছে উপরের ছবির সবকিছু বিশ্ময়কর জিনিসের সৃষ্টির। তাদের বিশ্বাস মতে, এই দেবতা এতই দক্ষ যে, চোখকে অদ্ভুদ সৌন্দর্যময়ভাবে তৈরীর জন্য সে ভুলে নাই প্রথমেই এর জন্য দুটি গহ্বর তৈরী করা দরকার। আবারও এদের বিশ্বাস অনুযায়ী, এই শক্তি এতই বুদ্ধিমান এবং জ্ঞানসম্পন্ন যে ফলমূল শাক সবজি এসবও সৃষ্টি করতে সক্ষম ছিল মানুষ এবং জীবের প্রয়োজনে।

মানুষের শ্বাস প্রশ্বাস ব্যবস্থার নকসায় নিঃশ্বাস নেয়ার জন্যও তৈরী করেছেন দরকারি পরিবেশ এবং আবহাওয়া। এখানে সামঞ্জস্য এমন এক ব্যবস্থাপনায় করা হয়েছে যে এক জীবের জীবন আর এক জীবের জীবনের উপর নির্ভরশীল; গাছের সঙ্গে অক্সিজেনের অস্তিত্তের নির্ভরতা, উদ্ভিদ যেমন পানির উপর, পানি আবহমন্ডলের উত্তাপএর উপর; আর এইসব প্রক্রিয়াই নির্ভর করে ভূমণ্ডলের আবর্তন বা পরিক্রম এর উপর, এই পরিক্রমন, যা নির্ভর করে স্বর্গীয় বস্তুর থেকে আগত মহাকর্ষিয় শক্তির আকর্ষনের উপর, সুর্য্য এবং চন্দ্রের দূরত্ব, এরকম হাজারো নানারকম বিশদ বিষয়। প্রতিটি বস্তুই লালিত হয় অন্য বস্তু কর্তৃক এইজন্য একটির লুপ্ত হওয়া মানে আর একটির ক্ষতি সাধন। বিবর্তনবাদীরা মনে করে, দৈবতার স্বচেতনতার স্তর এমন পর্যায়ে যে সামান্য বিষয়ও এর আয়ত্বের বাইরে হয় না!

উপর্যুপরি, সময়ের আবর্তে এই দেবতা লক্ষ কোটি জীবের সৃষ্টি করেছেন এবং প্রতিটিকে দিয়েছে বিশেষ বৈশিষ্ট। বিবর্তনবাদীদের মতে, এই দেবতা এমন যে যা কিছুই সে করতে চায় তা সে করতে পারে। যদি সে চোখ তৈরী করতে চায়, সে তা তৈরী করে; বাহু তৈরী করতে চায় তাও পারে। সে ধারনা করে যা

কিছু সে তৈরী করতে চায় এবং কিভাবে করতে চায়, নির্ভুল ফলাফলও তার আয়ত্তে। চোখের যখন অস্তিত্ত ছিল না, যখন দৃষ্টি বলে কিছু ছিল না, দৈবতা খুলির মধ্যে দুটি গহ্বর তৈরী করেন, এর মধ্যে তরল পদার্থ ভরে দেন যার মধ্যে দিয়ে আলো প্রতিফলিত হতে পারে। পরে, দুটি লেন্স প্রতিস্থাপন করেন তরল পদার্থের উপরে যা সহজেই আলোর প্রতিসরণ ঘটায় আর চোখের পশ্চাদভাগের দেয়ালে প্রতিবিম্বিত করে। এরও পরে, যেন চোখ চারপাশটা দেখতে পায়, সে তৈরী করে অপটিক পেশী। এরপরেও চোখ থাকে অসম্পুর্ণ, সুতরাং সে তৈরী করে অক্ষিপট (রেটিনা) পেছন থেকে যা আলো ধারণ করে, এর সঙ্গে থাকে স্নায়ুতন্ত্রী যা মগজের সাথে থাকে সংযুক্ত, চোখের পানির গ্রন্থি শুষ্কতা থেকে রক্ষা করার জন্য এবং জোড়া জোড়া চাখের পাতা ও এর লোম চোখকে ধুলি বালি বা বাহিরের অন্যকিছু থেকে রক্ষা করার জন্য। আর, ডারউইন এর দেবতা এতসব নিখুঁত অঙ্গের সবই করেন পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় – এই প্রক্রিয়ায়, সাধারন অবস্থায়, তৈরী করে অঙ্গবিকৃতি, প্রশ্রয় দেয় ত্রুটি এবং অসুস্থতা যার কোন নির্ভুল সুফল প্রভাব মানুষের মধ্যে ফেলে না।

বিবর্তনবাদীদের ধারনামতে, ডারউইনবাদের দেবতার মধ্যেও আছে বিশেষ সৌন্দর্যবোধের পরিমাপ যা তিনি সৃষ্টির সময় খেয়াল রাখেন। জীব অথবা জড়, সে খেয়াল রাখে এর বর্ণ, চেহারা, রুচি, গন্ধ এবং আকার সবই উপযুক্তভাবে সৌন্দর্যময়। যখন কোন সবজি বা ফল তৈরী করেছেন, খেয়াল রেখেছেন এর স্বাদ, গন্ধ, আকার, এর ভিটামিন, খনিজ, শর্করা, ক্যালোরি এবং চিনির পরিমাপের উপর। শুধু স্ট্রবেরী তৈরী করেই সন্তুষ্ট হন নাই, তিনি এর মধ্যে দিয়েছেন লোভনীয় গন্ধ ও আকর্ষণীয় আকৃতি। আর অবশ্যই মানুষের কাছে এই স্বাদ এবং গন্ধের আবেদন দিয়েছেন যাতে তারা তা ভোগ করে। বিখ্যাত ফরাসি প্রানীবিদ, পিয়ার পল গ্রাসে এই ধারণা সন্মন্ধে এই ভাব প্রকাশ করেনঃ

> ***পরিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্যে সুবিধাজনক বা সময়োচিত সময়ে জন্তু বা উদ্ভিদের প্রয়োজনকে মেটানোর অনুমোদন করাটা নেহায়েতই বিশ্বাস করা কঠিন। এরপরও ডারউইনের তত্ব হচ্ছে আরো চাহিদাপ্রবনঃ একক একটি উদ্ভিদ, একক একটি জন্তুর প্রয়োজন হাজার হাজার সৌভাগ্যময় যুতসই ঘটনার। আর এইভাবে অলৌকিক ব্যাপারই হয়ে উঠবে নিয়মঃ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘটনাচক্রের সম্ভাব্যতা বিফল নাও হতে পারে... দিবাস্বপ্নের বিপক্ষে কোন আইন নাই, কিন্তু বিজ্ঞান এর উপর নির্ভর করতে পারে না বা অবশ্যই এসবকে প্রশ্রয় দিতে পারে না।*** [৬৪]

সুতরাং ডারউইনের ধর্মের মুলে হচ্ছে এই বিশ্বাস যা হচ্ছে বিজ্ঞান বিরোধী, বুদ্ধিমত্তা বিরোধী এবং অসংবেদনশীল। যদি মানুষের বুদ্ধিমত্তায় এই ক্ষমতা থাকে যে একটি অতি জটিল গঠন প্রক্রিয়া দৈবভাবে ঘটতে পারে না আর তা অবশ্যই কোন বুদ্ধিমান পরিকল্পনার ফসল বা প্রতিফলন, তাহলে ডারউইনবাদ সম্পুর্নভাবে মানুষের যুক্তি বা বুদ্ধির বিপরীত অবস্থানে। কিন্তু সেই আদিম অবিশ্বাসী বা মুর্তিউপাসকদের মত, যারা যুক্তি বা বুদ্ধির বাহিরে উপাসনা করত মুর্তির যা তারা নিজের হাতে তৈরী করত, ডারউইন এর তত্ব একইভাবে মানুষের যুক্তিগুলোকে অবজ্ঞা করছে এবং তাঁদের শিক্ষাই মেনে চলছে। প্রখ্যাত আণবিক জীববিজ্ঞানী মাইকেল ডেন্টন – Michael Denton (British-Australian Biochemist, Author, born in 1947), এই চমকপ্রদ

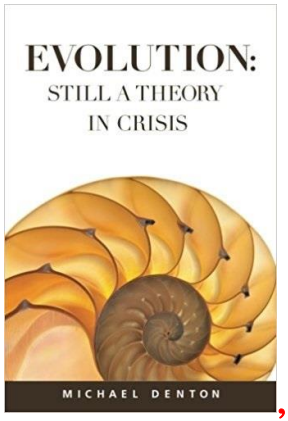

অবস্থার বিবরণ দিয়েছেন এইভাবেঃ,

> সন্দেহবাদীদের কাছে প্রস্তাবনায় যে উন্নত অঙ্গ প্রতঙ্গের সৃষ্টির কর্মযজ্ঞে রয়েছে হাজার হাজার কোটি তথ্য এককের সমাহার, যার সমকক্ষ হতে পারে হাজার হাজার খন্ডের একটি ছোট্ট বইঘরে কয়েক অক্ষর এর পংক্তি, যার মধ্যে আছে সঙ্কেতাক্ষরে লিখা অগুনতি হাজারো জটিল গাণিতিক-Algorithms, পরিভাষা যা নিয়ন্ত্রন করছে, উল্লেখ করছে এবং আদেশ দিচ্ছে লক্ষ লক্ষ কোটি কোষের জটিল অবয়বের সৃষ্টি এবং উন্নয়নের। আর এর সবকিছুই সুবিন্যস্ত হছে কেবলই লক্ষ্যহীন বা যথেচ্ছ এক প্রক্রিয়ায় - নিয়ম নীতির এ এক অতি সাধারন অপমান। কিন্তু ডারউইনবাদীদের কাছে কোন রকম সন্দেহ ব্যতিরেকেই এই ধারণা গ্রহনযোগ্যতা পেয়েছে – এই দৃষ্টান্তই তাদের কাছে অগ্রগামী! [৬৫]

কেহ এই সিদ্ধান্তে আসতেই পারে যে ডারউইন এবং আদিম কুসংস্কারময় বিশ্বাসীদের সঙ্গে রয়েছে বিশাল সামঞ্জস্যতা। যেমন পৌত্তলিক উপাসকরা বিশ্বাস করে যে প্রাণহীন প্রতিমাগুলোই সৃষ্টি করে, বিবর্তন আর বস্তুবাদীরা মনে করে প্রাণহীন বস্তুই, বিভিন্নরকম যথেচ্ছভাবে ঘটে যাওয়া ঘটনার মাধ্যমে, প্রানের আবির্ভাব ঘটিয়েছে যার মধ্যে তারা নিজেরাও রয়েছে।

সুতরাং ডারউইনবাদী ধর্মের ভিত্তিই হচ্ছে এক বিভ্রম, মায়া। যাহাইহোক, এমনকি এর প্রতিষ্ঠাতা, চার্লস ডারউইন এটা জানতেন যে জটিল জীব সমুহের অস্তিত্তে আসাটা কোন দৈবতার কারনে হতে পারে না। প্রকৃতির নিখুঁত বিন্যাস তাঁকে দেখিয়েছে যে প্রত্যেকটি জীবন্ত বস্তুর মধ্যে রয়েছে এক অপুর্ব নকশাশৈলি আর পরিকল্পনা। ডারউইন তার এই সন্দেহ এইভাবে প্রকাশ করেছেনঃ

> যাহাইহোক আমি এই বিস্ময়কর পৃথিবী অবলোকন করে সন্তুষ্ট হতে পারি না বিশেষ করে মানুষের প্রাকৃতিক বিশিষ্টতায়..... আমি প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হয়েই সবকিছুকে দেখতে চাই যা কিছুই এই পরিকল্পনার আইনের ফসল..... এই সকল আইনই একনিষ্ঠভাবে পরিকল্পিত হয়েছে একজন সর্বদর্শী শ্রষ্টার দ্বারা, যিনি ভবিষ্যতের সবকিছু ঘটনা এবং এসবের পরিণাম জানেন। কিন্তু এসব আমি যতই ভাবি ততই হতভম্ব হয়ে যাই। [৬৬]
>
> আমি সচেতন যে আমি দারুণভাবে এক আশাহীন কাদাজুলের মধ্যে অবস্থান করছি। আমি ভাবতে পারিনা যে এই বিশ্ব, যেভাবে একে আমরা দেখতে পাই, তা কোন হটাত দুর্ঘটনার ফসল; এরপরও আমি প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা বস্তুকে পুর্ব পরিকল্পনার ফল হিশেবে দেখতে পারি না। [৬৭]
>
> খুবই আকর্ষণীয় এবং অনুসন্ধিৎসু অনেক বর্ণনা আমি দিতে পারি বিভিন্ন শ্রেনীর সব কিছুর (জীব); এতবেশী যে আমার মনে হয় যে এটা কোন দৈবযোগ বা ঘটনাচক্র নয়। [৬৮]

ধর্মের উপর মিশনারি কার্যক্রমের প্রভাব

যারা কোন ভাবাদর্শ অথবা ধর্ম প্রচার করে সাধারণভাবে তারা এসবের বিশ্বাসী বা অনুসারী। দুনিয়া জুড়ে ডারউইনবাদের প্রভাব বিস্তার করে মুলত যারা এর প্রচার প্রক্রিয়াকে দায়িত্ব হিশেবে মনে করে ধার্মিক কারনে, আর এই ধারণা অনেক ধর্মেই আছে। ধর্মপ্রচারক লোকেরা এক যায়গা থেকে অন্য যায়গায় ভ্রমন করে প্রচার করে তাদের ধর্ম, অনুসারী সংগ্রহ করে আর প্রচেষ্টা চালায় প্রতিটি লোকালয়ে কোন সংস্থা স্থাপনের। ধর্মপ্রচারকদের মুল উদ্দেশ্যই হচ্ছে পথ বাৎলে দেয়া যা তাদের ধর্মের সঙ্গে খাপ খায়, এই উদ্দেশ্যেই অন্যকে নিজেদের পরিমন্ডলে গ্রহন করে মুল্যবোধ, বিচার এইসব আদানপ্রদানের জন্য।

ডারউইনবাদী ধর্মপ্রচারকদের বিরাট লক্ষই হচ্ছে একটি সমাজ গঠনের যেখানে জীবন সন্মন্ধে সবাই একই ভাবধারায় উজ্জীবিত, প্রকৃতপক্ষেই, একটি সমাজ যেখানে সব প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে শিক্ষা পদ্ধতি তাদের নৈতিকতায় স্থাপিত হবে। তাদের লক্ষ একটি প্রজন্মকে প্রশিক্ষিত করে তোলা এইভাবে যে তারা ঈশ্বর বা সৃষ্টি কর্তার অস্তিত্তের বিরুদ্ধবাদী হয়, জীবন সন্মন্ধে বস্তুবাদী ধারনা গ্রহন করে, উপাসনা করে এর বর্ত্তমান উপাসকদের এবং অন্ধভাবে এই ভিত্তিহীন ধর্মকে অনুসরণ করে এর অবোধগম্যতা ও অযৌক্তিকতা স্বত্বেও। এই সব কিছু ধারণায় রেখে যাদেরকে পছন্দ করা হয় তাদের মধ্যে ধর্মপ্রচারকদের গুনাবলির এইসব নির্যাস প্রাধান্যে থাকে। তারাই হোল এইসব লোক যারা ধর্মের জন্য বস্তুবাদী এবং আধ্যাত্মিক সহায়তা প্রদান করবে এবং যারা ভবিষ্যতে মানুষকে প্রভাবিত করার শক্তি অর্জন করবে এবং বড় বড় সমাবেশে অংশ নেবে।

ডারউইনবাদী এই ধর্মপ্রচারকরা হতে পারে যে কোন পেশা অথবা শিক্ষাগত পেক্ষাপট থেকে, আর দরকার নেই তাদের বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণের অথবা উচ্চমাত্রার জ্ঞানার্জনের। যথার্তই, চার্লস ডারউইন নিজে সত্যিকারের বিজ্ঞানী ছিলেন না, তিনি ছিলেন মুলত ধর্মতত্বের কিন্তু ধর্ম থেকে তিনি দূরে সরে গিয়েছিলেন। যারা তার তত্বকে ছড়িয়ে দেয়ার ব্যাপারে গুরুত্বপুর্ণ ভুমিকা রাখেন তারা হলেন, চার্লস লীল ছিলেন উকিল, উইলিয়াম স্মিথ একজন জরিপ নিরীক্ষক, জেমস

হাট্টন একজন কৃষিবিদ, জন প্লেফেয়ার একজন গণিতজ্ঞ, রবার্ট চেম্বারস একজন সাংবাদিক আর আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস জরীপ কাজের জন্য কিছুদিন শিক্ষানবিশি করেন।[৬৯]

ডারউইন এইসব লোকদের তাঁর সিপাহী হিশেবে গন্য করতেন যারা সামাজিক ক্ষেত্রে লড়াই করে যাবে কেননা তিনি নিজে এসবে সংশ্লিষ্ট হতে পছন্দ করেন নাই। সাধারণের মধ্যে কথা বলা বা তর্ক করার ধারণায় তিনি অসুস্থতা অনুভব করতেন। রিচার্ড মিলনার, পরের দিকের একজন সুপরিচিত বিবর্তনবাদী, যিনি অনেক গবেষণা করেছেন ডারউইন এর জীবন এর উপর, এইসব লোক সন্মন্ধে তিনি বর্ননা দিয়েছেন এইভাবে যে এরা "ডারউইন এর বিদ্রোহী দল"।

সময়ে ধর্ম প্রচারকারীদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে, এবং ডারউইন এর ধর্মের প্রসার দুনিয়ায় একটি আদর্শ হিশেবে চলে আসে, যার সমর্থনে সমাজের বিভিন্ন অংশের লোকজন এগিয়ে আসতে থাকে। যাদের মধ্যে প্রথমেই যার কথা মনে আসে সে হচ্ছে থমাস হাক্সলে – Thomas Huxley, যার পরিচিতি ছিল ডারউইন এর বুলডগ হিশেবে। তাঁর ছেলে জুলিয়ান হাক্সলি- Julian Huxley, ও থিওডসিইয়াস ডবঝনস্কি- Theodosius Dobzhansky; আধুনিক কালের রিচার্ড ডকিন্স- Richard Dawkins এবং ষ্টেফেন জে গুল্ড- Stephen Jay Gould। এদের সবার মধ্যে যে ব্যাপারটা বেশ উল্লেখযোগ্য যে তাদের মধ্যে অসঙ্গতি সত্যেও (যা তারা স্বীকার করে), ডারউইন বাদের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রত্যাহারে তাঁরা অস্বীকৃতি প্রকাশ করে। তাদের জীবনের সবকিছুতে, তাদের লেখায়, তাদের কথোপকথনে তারা সবসময় বিবর্তন তত্বকে সুরক্ষা দিয়ে গেছেন। অনেক সময় খোলাখুলিভাবে তাদেরকে এর অকাট্যতা নিয়ে আপত্তি দেয়া হয়েছে কিন্তু তাদের অন্ধ অনুসরণ একগুঁয়ে করে রেখেছিল তাদের, বরং তারা বক্তৃতাবাজির আশ্রয় নেয় এবং তর্কে জিতবার জন্য পাশ কাটিয়ে যায় আসল ঘটনা। প্রতিটি বিতর্কে তারা বিপক্ষের বিরুদ্ধে আক্রমনাত্মক ভুমিকা নেয় যার সাথে যোগ করে অপমান আর উপহাস।

তাদের বিশাল সমর্থন আসতে থাকে গণসংযোগ সংস্থা গুলো থেকে যারা বিবর্তনবাদী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত।এইসব সংস্থা ডারউইনবাদের এই বার্তা সবার কাছে সম্প্রচার বা ছড়িয়ে দেয়াকে তাদের কর্তব্য বলে মনে করে; বস্তুত এই গণমাধ্যমই বিবর্তন এর বিশ্বাসের বিরাট প্রভাবের পেছনের কারণ। আর এইসব বিবর্তনবাদী বিজ্ঞনীরা যারা এইসব গণমাধ্যমকে সহায়তা করে তাদের মতামত এবং তথাকথিত বৈজ্ঞানিক তথ্য দিয়ে, আর তারা বিজ্ঞানীদের প্রতি মানুষের সন্মান এবং আস্থা এসবেরই সুযোগ নিত।

প্রতিটি দেশেই ডারউইনবাদী প্রচারকদের ভুমিকা এবং পদ্ধতিগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে। মানুষের কল্পনা বা দর্শনকে ঘোলাটে করতে তারা দুটি ভিন্ন কর্ম পদ্ধতি ব্যাবহার করে। প্রথমটি হচ্ছে ডারউইনবাদের খোলাখুলি উদ্ভাসন বা ব্যাখ্যা করা আর এই মতবাদের উপস্থাপন পুস্তক বা গণমাধ্যমের মাধ্যমে। ডারউইনের বিষয় গুলির উপর মেলা প্রবন্ধ অনবরত প্রকাশ পেতে থাকে সাময়িকী এবং খবরের কাগজে, এইসব প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক বিশ্বস্ততা বা শুদ্ধতা অল্পই গুরুত্ব বহন করত; মুল বিষয় ছিল মানুষকে সৃষ্টির মুল সত্য থেকে দূরে সরিয়ে নেয়া এবং তাদেরকে এই ধারণায় সহজাত করে তোলা।

উইলিয়াম স্মীথ

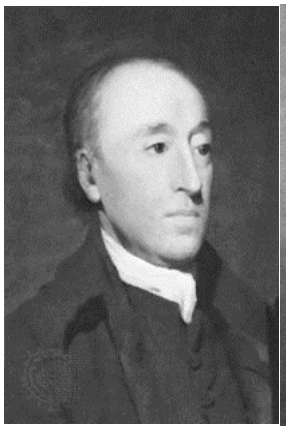

জেমস হাট্টন

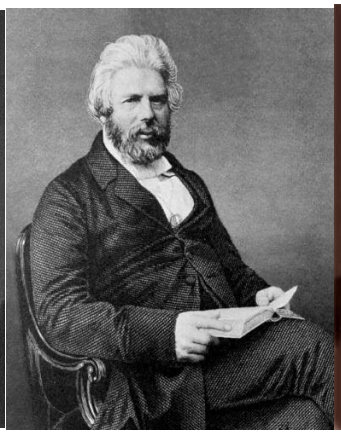

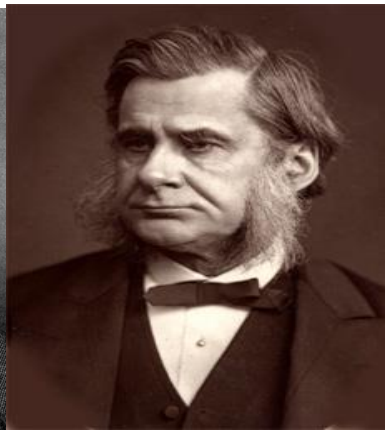

আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস

Darwin's Bulldog – Thomas Huxley and his son Julian Huxley, Stephen Jay Gould and Richard Dawkins

ডারউইনবাদের ভ্রষ্ট নৈতিকতার চেতনা

দ্বিতীয় পন্থাটি হোল পরোক্ষভাবে জ্ঞাত করানো। যে পরামর্শ ডারউইনবাদীরা লোকজনদের দেয় তা হোল, "তোমার কারও কাছেই কোন দায়বদ্ধতা নেই কেননা তোমার জীবন তো নিজেই অস্তিত্তে এসেছে দৈবক্রমে। টিকে থাকার এই সংগ্রামে হয়তবা অন্যকে দমন বা নাশ করতে হবে; এই দুনিয়া হচ্ছে দ্বন্ধ সঙ্ঘাত এবং স্ব প্রয়োজনের যায়গা"। ডারউইনবাদের জীববিদ্যার ধারনার মধ্যে এই বাণীই দেয়া হয় যেমন "প্রাকৃতিক নির্বাচন –natural selection", "যথেচ্ছ বা এলোপাথাড়ি পরিবর্তন-random mutation", "টিকে থাকার সংগ্রাম- struggle for survival", "যোগ্যতমদের টিকে যাওয়া – survival of the fittest" ইত্যাদি। বিভিন্ন সমাজে আজকাল এইসব ভাবনার বেশ কদর এবং সেখানে তারা এই মনোভাবেই জীবন চালিত করে। তারা বাস করে এই দুনিয়ায় একটি ভাল চাকুরীর প্রত্যাশা নিয়ে, সম্পদ অর্জনের জন্য, টাকা কড়ি আয় করার জন্য, বিনোদনের জন্য এবং জীবনের এই সংগ্রামকে উন্নীত করার জন্য। যাদের চিন্তা শক্তির পরিমাপটা এইরকম তাদের মনে প্রশ্ন আসে না তাদের অস্তিত্তের কারণ অথবা অল্লাহর অস্তিত্তের কথা। তাদের আল্লাহর ব্যাপারে কোন আগ্রহ বা দায়িত্ববোধ নেই যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন। বেশীরভাগই বিবর্তনবাদের তত্বের ব্যাপারে একেবারেই অজ্ঞ অথবা ডারউইন এর চিন্তাধারা বা বিশ্বাস সন্মন্ধেও কোন পড়াশুনা নেই কিন্তু তারা জীবনকে ডারউইন এর দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই অবলোকন করে।

ডারউইনবাদের গুপ্ত বা চোরাগোপ্তা পরামর্শই তাদের নৈতিকতার আদর্শ বা ধর্ম হিশেবে সমাজে সাধারণভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। এমনকি যদি প্রচারকদের সংখ্যা সমাজে অল্পও হয়, তারাই প্রভাব বিস্তার করে এইসব ধারণার। এই দলটি শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী থাকে বিশ্ববিদ্যালয়, বৈজ্ঞানিক সংস্থাগুলিতে এবং সমাজের প্রায় প্রতিটি বিভাগে। এরা সমাজে নির্দেশনা দেয়, শিক্ষার রাজনিতি নির্দিষ্ট করে, এবং সাধারণের মধ্যে বিবেক তৈরী করে গণমাধ্যমের সাহায্যে। আর এর মধ্যে বিশালভাবে রচিত হয় নাস্তিকতার বিবর্তনবাদ।

যদিও অনেকের মনে, তারা কোথা থেকে এসেছে এই প্রশ্নে নির্লিপ্ততা থাকে, এদের বেশীরভাগই আবার ছায়াছবির নির্মাতা, খবরের কাগজ এবং সাময়িকী প্রকাশক, নাট্যশালা গুলিতে প্রভাব বিস্তারকারী, এদের অবস্থান কলা শিল্পের কেন্দ্রগুলিতে, প্রকাশনা ভবনগুলিতে আর গান বাজনার শিল্পে, এরা নিজেদের

‘আলোকিত’ হিশেবে গণ্য করে আর এইসব লোক ডারউইনবাদকে ধর্ম হিশেবে বিশ্বাস করে। অতএব, যখন একটি যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ে যায়, সে থাকে একজন ডারউইনবাদী শিক্ষকের প্রভাবে; যখন সে কোন বই মেলায় যায়, সেখানে সে পায় ডারউইনবাদ এবং নাস্তিকতার বই; নাট্যমঞ্চে বা শিল্প কলার প্রদর্শনিতে একই বার্তা তাঁর মগজ ধোলাই করে। আর এইভাবে, এক অধার্মিক ধারণাশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি শিক্ষা এবং সমাজে প্রভাব বিস্তার করে এবং এইভাবে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে সঞ্চালিত হয়।

যারা এই নীতিবাদী ধারণার প্রভাব বলয়ে গমন করে তারা বিশ্বাস করে যে ডারউইনবাদ হোল এক বৈজ্ঞানিক সত্য। তারা এটাকে অন্ধভাবে গ্রহন করে এবং সত্য ধর্মকে মনে করে এক ঐতিহ্যগত বিশ্বাস যা কেবলই অশিক্ষিত লোকের গোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত, যা কুরআনএ এইভাবে বর্নিত হয়েছেঃ

وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ ۙ قَالُوٓاْ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ

যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমাদের পালনকর্তা কি অবতীর্ণ করেছেন? তারা বলে, পুর্ববর্তীদের কিসসা-কাহিনী। [৭০]

যাহাই হোক, প্রকৃত ধর্ম, যা হোল ইসলাম, যার সঙ্গে প্রথা বা ঐতিহ্য এসবের কোন সম্পর্ক নেই; এ হোল প্রকৃত সত্য আল্লাহ তায়ালা কত্তৃক আদেশিত, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ও নির্দেশিকা দিয়েছেন। যারা ডারউইনবাদ দ্বারা প্রতারিত হয়েছেন আসলে তাদের রয়েছে নিষ্প্রভ চেতনা যা তাঁদের সত্যকে অধিগ্রহণ করার স্বামর্থ দেয় না। আর এই মিথ্যা ধর্মের মুখোস উন্মোচন করতে ও ঔদাসিন্যের পর্দাকে খুলে ফেলতে - যা সমাজকে আবৃত করে রেখেছে, ডারউইনবাদ এবং বস্তুবাদী দর্শনকে অবশ্যই পরাস্ত করতে হবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে।

ডারউইনবাদী ধর্ম এমন বেড়াজালে ঘেরা এ নিয়ে প্রশ্ন তোলাও নিষিদ্ধ

ডারউইনবাদী ধর্ম নিছক বক্তৃতাবাজির ফসল এই সত্য সত্যেও, এটা মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে। তারা এনিয়ে প্রশ্ন করতে পারে না কেননা প্রশ্ন তোলা নিষিদ্ধ করা হয়েছে; এই ধর্ম চায় নিস্বর্ত সার্বিক বিশ্বাস।

একজন ডারউইনবাদী হতে হলে এটা দরকার যে সে বিশ্বাস করবে জীবসকল তৈরী হয়েছে জড় পদার্থ থেকে, সরীসৃপগুলো উড়তে শুরু করে কোন পদ্ধতির যোগসাজশের ফল বশত, যে খুবই জটিল জীবসত্তা বা অঙ্গ যেমন কোষ এবং অবশেষে চোখ এবং কান, অস্তিত্তে এসেছে এলোপাথাড়ি ঘটনাচক্রে, যে সামুদ্রিক প্রাণী যেমন তিমি’র উৎপত্তি হয়েছে ভালুকের মত স্তন্যপায়ী জীব যে কিনা সমুদ্রে গিয়েছিল খাবারের অণ্যেষায়, যে ডাইনোসরগুলি মাছির পেছনে দৌড়ানোর ফলে নিজেদের পাখার বিকশিত করে এবং পাখিতে রুপান্তরিত হয়ে যায়।

এই সবই প্রমান করে যে এইসব পুর্বধারণা কতখানি অযৌক্তিক ও অসঙ্গত। যারা এসব পড়ে তারা মনে করে যে যেহেতু নামকরা ও সন্মানজনক সব বৈজ্ঞানিকরা এসব বিশ্বাস করে অতএব তাদের কাছে নিশ্চয় এসবের প্রমান আছে। কিন্তু তাদের কাছে সামান্যতম প্রমাণও নেই – শুধুই অনুমান, যুক্তিতর্কহীন পুর্বানুমান, সম্ভাব্যতা এবং খেয়াল। এইসবের সিদ্ধান্ত আগেই নেয়া হয়েছে; এখন দরকার এসবকে বিশ্বাস করার।

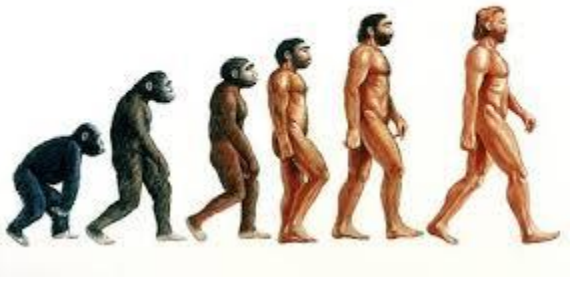

সব থেকে যেটা মানুষকে এই ধর্মে বিশ্বাস করানোর জন্য দরকার সেটা হোল শুধু একটি প্রবন্ধ কোন সাময়িকীতে বা বইএ অথবা একটি সংক্ষিপ্ত তথ্যচিত্র। এমনকি যদি কেউ ইচ্ছাও করে, সে না প্রশ্ন করতে পারে বা না পরীক্ষা কিংবা অনুসন্ধান করতে পারে এরকম জীবাশ্ম (ফসিল) যা নিশ্চিত করতে পারে পরিবর্তন কালীন অবস্থার যা মনগড়াভাবে অঙ্কিত বা বর্নিত আঁকাজোকায় যেসবকে সত্য হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। সে নিজে কোন পরীক্ষাও চালাতে পারবে না, যেমন মিলার'র (Miller) গবেষণা যাকে বৈজ্ঞানিক উন্নয়ন বা ক্রমবিকাশের পরিপন্থী হিশেবে বাতিল করা হয়েছে।[৭১] যারা এই ধরণের প্রকল্পে সংযুক্ত হতে চায় তাদেরকে সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানীদের গণ্ডি থেকে সরিয়ে দেয়া হয় আর যারা এসব করে তারা হচ্ছে এই ডারউইনবাদী ধর্মপ্রচারক; আসলে, তাদেরকে 'সমাজচ্যুত' করা হয়। তারা যদি এইসব সত্য নিয়ে একটুও ভেবে দেখে তখনই তাদের সামনে প্রকৃত ব্যাপারটি অনুধাবিত হবে।

যাদের সামান্যতম বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আছে তারা জানে যে একটি মাছের জন্য যথেষ্ট সময় থাকে না ডাঙ্গায় এসে নুতন পরিবেশে খাপ খাইয়ে নেয়ার মত, কেননা অল্প সময়েই সে মারা যায়। যারা পড়াশুনা করেছেন কোষের জটিল গঠন প্রক্রিয়া নিয়ে তারা বুঝতে পারবে যে তা কেবল দৈব ঘটনা বা এলোপাথাড়িভাবে তৈরী হতে পারে না। তিনি বুঝতে পারবেন একটি সরীসৃপের কখনই অহেতুক দৈবক্রমে পাখা গজাতে পারে না এবং সে উড়ে বেড়াবে। সাধারণ জ্ঞানের আওতায়ই এসব বোঝা যায়, আর যা কি না যে কোন ধরনের পরীক্ষা বা গবেষণার দ্বারাই প্রমাণিত হতে পারে। কিন্তু যে সব লোকের চিন্তাভাবনা ডারউইনবাদী ভাবধারায় আচ্ছাদিত তারা এসব ভাবতেই চায় না; তারা ভয় পায় এসব নিয়ে ভাবতে।

যাহাইহোক, মানুষ চিন্তায় মননে, অনুসন্ধিৎসায় এবং অবলোকনের মাধ্যমেই কেবল সত্যের উন্মোষ ঘটাতে পারে, নিজেকে কুসংস্কার বা পুর্বানুমান থেকে পারে রক্ষা করতে আর অতিক্রম করতে পারে নিষেধাজ্ঞার (taboo) বেড়াজাল। ভূমণ্ডলের সৃষ্টি যে আল্লাহ তায়ালা করেছেন এটা বুঝতে হলে, মানুষকে গভীরভাবে ভাবতে হবে এই দুনিয়া এবং আসমানের (স্বর্গ) উদ্ভব বা তৈরীর কথা। আর যখন কেহ নিজেকে কুসংস্কার বা আবদ্ধ ধারণা থেকে মুক্ত করে, তখনই কেবল এই নিষ্পত্তিতে আসতে পারে যে একজন সর্বোচ্চ সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন সেখানে। কুরআন এর মধ্যে আল্লাহ দেখিয়েছেন মানুষের নিজের বিবেক বুদ্ধির ব্যবহারের গুরুত্বঃ

إِنَّ فِى خَلۡقِ ٱلسَّمَـٰوَٲتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَٱخۡتِلَـٰفِ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلۡفُلۡكِ ٱلَّتِى تَجۡرِى فِى ٱلۡبَحۡرِ بِمَا يَنفَعُ
ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحۡيَا بِهِ ٱلۡأَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِہَا وَبَثَّ فِيہَا مِن ڪُلِّ دَآبَّةٍ
وَتَصۡرِيفِ ٱلرِّيَـٰحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلۡمُسَخَّرِ بَيۡنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ لَأَيَـٰتٍ لِّقَوۡمٍ يَعۡقِلُونَ (١٦٤)

"নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের বিবর্তনে এবং সাগরে জাহাজের চলাচলে মানুষের জন্য কল্যাণ রয়েছে। আর আল্লাহ তায়ালা আকাশ থেকে যে পানি বর্ষন করেছেন, তদ্দ্বারা মৃত যমীনকে সজীব করে তুলেছেন এবং তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সবরকম জীব-জন্তু। আর আবহাওয়া পরিবর্তনে

এবং মেঘমালা যা তাঁরই হুকুমের অধীনে আসমান ও যমিনের মাঝে বিচরণ করে, নিশ্চয়ই সে সমস্ত বিষয়ের মাঝে নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্যে''। [৭২]

ٱلَّذِينَ يَذۡكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَٰمٗا وَقُعُودٗا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمۡ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلۡقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ رَبَّنَا مَا خَلَقۡتَ هَٰذَا بَٰطِلٗا سُبۡحَٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ (١٩١)

''যারা দাঁড়িয়ে, বসে, ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টির বিষয়ে, (তারা বলে) আমাদের প্রভু! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা তোমারই, আমাদিগকে তুমি দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচাও''। [৭৩]

ডারউইনবাদী নেতৃবৃন্দ অবগত যে চিন্তার স্বাধীনতা মানেই তাদের বিবর্তনবাদি চিন্তার অবসান, আর এই কারনেই তারা নিরুৎসাহিত করে চিন্তাকে। যে পদ্ধতিতে তারা মানুষকে উপদেশ দেয় যে তাদের সেই তথাকথিত বৈজ্ঞানিক বিষয়টি আসলে খুবই জটিল এবং বুঝে উঠাটা সহজ নয় বা কঠিন। তারা ব্যবহার করে অবোধ্য পরিভাষা, প্রাচীন রোমের ভাষা (ল্যাটিন ভাষা) এবং বৈজ্ঞানিক উপমা আর জোর দেয় যে এই জিনিষগুলি সাধারন মানুষরা কখনই বুঝে উঠতে পারবে না। এইভাবেই লোকজনকে প্ররোচিত করে প্রত্যয় জন্মানো হয় শুরু থেকেই যে তারা এসব হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না আর ডারউইন বাদের মুল সুত্র গুলো কেবলই বিজ্ঞানের অধিপতিরাই বুঝতে পারে। বিব্রতকর অবস্থা এড়াতে যেটা একমাত্র যৌক্তিক উপায়, যেভাবে তারা দেখে, শুধু সেসব গ্রহন করা তারা যেসব বলে। সুতরাং, ধর্মযাজক এবং তাদের অনুসারীদের মধ্যে একটি শ্রেণীবিভাগ বা যাজকতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে আর এখানে সবাই তাদের নিজস্ব অবস্থানটা সন্মন্ধে ওয়াকিবহাল।

কিন্তু এতসব সাবধানতা, বিধিনিষেধ এবং বাধা স্বত্যেও ডারউইনবাদীরা তাদের অনুগামীদের প্রতিরোধ করতে পারে না যখন তারা সন্ধেহ করতে থাকে কেননা তাদের পরিবেশ তাদেরকে হাজারো প্রমাণ দেয় সৃষ্টি সন্মন্ধে। ডারউইনবাদের তত্বকে সন্দেহ করার জন্য এটুকু ভাবাই যথেষ্ঠ এই ভ্রমান্ডের নির্ভুল শৃঙ্খলা, প্রতিটি জীবের আকর্ষনীয় সব বৈশিষ্ট, সম্পুর্ন নির্ভুলতায় দ্বীপ্তিমান সব সৃষ্টি - একটি অনু বা পরমাণু থেকে নক্ষত্রপুঞ্জ, প্রতিটি জীবের জটিল সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, অপরূপা প্রকৃতি, গোলাপের সুবাস, অথবা ফলের স্বাদ।

বিজ্ঞানের উন্নতি যখন বিবর্তনের তত্বকে বাতিল করে দিল, অনেক বৈজ্ঞানিক তখন এটাকে বিভিন্নভাবে স্বীকার করে নিল। ডারউইনবাদীরা সাধ্যমত সবকিছুই করল কিন্তু সত্যকে তারা কাদা দিয়ে ঢাকতে পারলনা। যত বেশী তারা এসবকে দমিয়ে বা চাপা দিতে চায়, আলোচনা, বই এবং গবেষনা প্রকাশনা যা ডারউইনবাদকে বাতিল হিশেবে উপস্থাপন করে তা সব সময়ে প্রকাশ হচ্ছে আর এসবের প্রচারকে আটকে দেয়া অসম্ভব। এরপর, ডারউইনবাদী প্রচারকরা ফিরে আসে তাদের বিশেষ জরূরী উপায়গুলোর একটি, তা হোল – জালিয়াতি।

বিবর্তনবাদীরা মনে করে জালিয়াতি করাটা অনুমোদিত

তাদের তত্বের সমর্থনে এবং এর মুল দাবি গুলোর লক্ষে, বিবর্তনবাদীরা অনেক সময় জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছে। আর এটাই হোল একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য পথ সন্দেহ দূর করার কেননা তারা অনুধাবন করতে পারে যে একটা নির্দিষ্ট সীমার বাইরে তাদের অসার কথামালা এবং বক্তৃতাবাজীর কোন মুল্য নেই। বিবর্তনবাদী তত্বের সমর্থকদের কাছ থেকে মানুষ অপেক্ষা করে আছে তথ্য প্রমাণের, কিন্তু শুধু যেসব প্রমাণ তারা দিতে পারে তা হচ্ছে ভুল বা জাল

প্রমাণাদি। তাদের কাছে আর কোন উপায় নেই যারা এক কাল্পনিক প্রক্রিয়ার কথা প্রচার করে, নুতন নুতন আবিস্কারকে লুকিয়ে রাখা ছাড়া, বা বিবর্তনের তত্বকে সমর্থন করার জন্য প্রমাণাদিকে ধ্বংস অথবা বিকৃত করা ।

এসবের মধ্যে একটি পদ্ধতি হোল আজগুবি সব অংকন দিয়ে তারা তাদের তথাকথিত গরিলা-মানবের প্রস্তাব সমর্থন করাতে চায়। বিগত দিনগুলোতে তারা একেছে বিচিত্র নকশা বা ছবি, আর এখন, কম্পিউটারের সাহায্যে তৈরী করে নুতন গরিলা-মানবের নকশা। কিন্তু তাদের উৎসাহের একমাত্র উৎস হোল কল্পনা কেননা তাদের কাছে কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই। সুতরাং, তারা আবিস্কার করে 'প্রমাণ' তাদের তত্বের সমর্থনে।

وَيُجَٰدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلۡبَٰطِلِ لِيُدۡحِضُواْ بِهِ ٱلۡحَقَّ وَٱتَّخَذُوٓاْ ءَايَٰتِي وَمَآ أُنذِرُواْ هُزُوٗا (٥٦)

যারা সত্যকে অস্বীকার করে তারাই মিথ্যা অবলম্বনে বিতর্ক করে, তা দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করে দেয়ার উদ্দেশে এবং তারা আমার নিদর্শনাবলী ও হুশিয়ারি গুলো, সেগুলোকে ঠাট্টারুপে গ্রহণ করেছে। [৭৪]

অবশ্যই, ইতিহাস সাক্ষী হয়ে আছে যে ডারউইনবাদীরা প্রচুর পরিমাণ জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছে এবং সেসব কেলেঙ্কারি হিশেবেই মেনে নেয়া হয়েছে। যেমন, পিল্টডন মানুষের মাথার খুলি যা আবিস্কার করা হয় ১৯১২ সালে এবং দুনিয়া শুদ্ধ মানুষকে তা ধোকা দিতে থাকে ১৯৫৩ সাল পর্যুন্ত। যা পরে বুঝতে পারা যায় যে এটা একটা নকল জীবাশ্ম যাকে একজন বিবর্তনবাদী তৈরী করেছিল মানুষের মাথার খুলি থেকে এবং ওরাংওটাং এর চোয়াল তার মধ্যে লাগিয়ে দিয়েছিল। খুলির মধ্যে দাঁত পরে লাগানো হয়েছিল এবং এমন মসৃণভাবে সাজানো হয়েছিল যে মনে হোত এসব মানুষেরই; যায়গা মত এগুলোকে এমনভাবে বসানো হয়েছিল যে চোয়ালের সঙ্গে তা বেমালুম লেগে ছিল। এরপর সব অংশে পটাসিয়াম ডাইক্রোমেট এর আবরণ দিয়ে এর প্রাচীনত্বের প্রমাণ আনা হয়েছিল। বিবর্তনবাদীরা এটাকে জীবাশ্ম হিশেবে বিলেতের জাদুঘরে, দুনিয়ার মধ্যে বিখ্যাত, প্রদর্শন করে চল্লিশ বছর। চল্লিশ বছর ধরে বৈজ্ঞানিক দুনিয়াকে এইভাবে ধোকা দেয়া হয়েছিল। [৭৫]

আরেকটি চমকপ্রদ জালিয়াতি যার মধ্যে জার্মানির একজন জীববিজ্ঞানীর নাম সংযুক্ত হয়েছে, আর্নষ্ট হ্যাকেল – Ernst Haeckel, ডারউইন এর সমসাময়িক এবং বন্ধু। তার তত্বের – অন্টজেনি রিক্যাপিটুলেটস ফিলোজেনি - Ontogeny Recapitulates Phylogeny, সমর্থনে সে কিছু অবাস্তব ও অলীক আঁকাজোকা তৈরী করে যার মাধ্যমে সে দেখায় মানুষ এবং মাছের ভ্রূণ, যেন তারা একই রূপ ধারী। সে এইসব ভ্রূণ এর ছবির মধ্যে আরো কিছু সংযুক্ত করে এবং কিছু অংশ সরিয়ে ফেলে অন্যটি থেকে। যখন এটা জানাজানি হয়ে যায়, সে তখন নিজেকে সমর্থন করে এই বলে যে অন্যেরাও এইরকম বিভ্রান্তিকর জিনিষ করেছিলঃ

'জালিয়াতির' এইরকম সমঝোতা মুলক স্বীকারোক্তির পর আমার উচিত নিজেকে এইভাবে ভাবা যে আমি নিন্দিত এবং পরিত্যাক্ত যদি না আমি দেখতে পেতাম আমার পাশাপাশি শত শত অভিযুক্ত কয়েদী কাঠগড়ায় যাদের মধ্যে আছে অনেক সুবিদিত এবং নামকরা সব জীববিজ্ঞানী, আমার জন্য এ এক সান্তনা । এসবের মধ্যে বিরাট

সংখ্যক ছবি সবচেয়ে ভাল পাঠ্যপুস্তকে, প্রবন্ধ এবং সাময়িকী গুলোতে ঘটতেই থাকবে একই ধরনের জালিয়াতির অভিযোগ নিয়ে কেননা সবগুলোই নিখুঁত নয়, এবং কমবেশি অদলবদল করা, প্রনালিসিদ্ধ করা এবং বানানো। [৭৬]

'Piltdown gang' painting by John Cooke, 1915, showing a famous gathering of men who studied the Piltdown skull.

© Geological Society of London

In 1912 Piltdown Man hit the headlines. Evidence of the evolutionary 'missing link' between apes and humans had been found, in England. For the next 40 years this momentous discovery influenced research into human evolution. Then in 1953 Piltdown hit the headlines again, this time revealed as a hoax, a scientific fraud of shocking proportions.

এতসব জালিয়াতির অল্প কিছুই গণমাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে, কিন্তু বিবর্তনবাদীদের ইতিহাস এর থেকে অনেক বেশী জালিয়াতির প্রমাণ দেয়ঃ কাল্পনিক ছবি, ভণ্ডামি করে পুনর্গঠন, জীবাশ্ম পরিবর্তন ... এসব জালিয়াতির উদ্দেশ্যই হচ্ছে তাদের তত্বকে সুদৃঢ় করা, এইসবের মাধ্যমে যতখানি

সাহায্য করা যায় – যা তারা বৈজ্ঞানিক প্রমাণাদির মাধ্যেমে করতে পারে নাই। আর এইসব বিভ্রান্তিকর এবং বেঠিক উধাহরনই হচ্ছে আসল প্রমাণ যে বিবর্তনবাদ উদ্ধত বা প্রমাণাদি ছাড়াই এক ধর্ম আর এর অনুসারীরা হচ্ছে অন্ধবিশ্বাসী যারা একে রক্ষা করতে কোন কিছু করতেই পিছু পা হয় না।

সারসংক্ষেপ

إِنَّ هَـٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمۡ فِيهِ وَبَـٰطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ (١٣٩)

এরা যে কাজে নিয়োজিত রয়েছে তা ধ্বংসের জন্যই নির্ধারিত হয়ে আছে এবং মূল্যহীন যা কিছু তারা করছে! সুরা আল আ'রাফ, ৭:১৩৯

ডারউইনবাদী ধর্মের তত্বে উদ্ভাসিত একজন নিজেকে প্রশ্ন করতে পারেঃ এই ধর্মের উদ্দেশ্যটা কি? ডারউইনবাদীরা, এদের সন্মানিত প্রতিষ্ঠাতা, এর 'পবিত্র' গ্রন্থ, এর যাজক প্রচারকারী এবং এর শক্তিশালী দুনিয়া ব্যাপি প্রতিষ্ঠানগুলি আসলে কি বাস্তবায়ন করতে চায়?

এই ধর্মের কেবল একটিই লক্ষ্যঃ আসল ধর্মের যায়গাটা অধিকার করা – বিশেষ করে অক্ষত ও নিষ্কলঙ্ক ধর্ম ইসলাম এবং এর ধ্বংস। অন্য কথায়, ডারউইন বাদ হোল সত্যিকারের ধর্মের বিরুদ্ধবাদী, ও বিকল্প হিশেবে দাবিকারী। প্রতিটি কুসংস্কারময় ধর্মেরই একই উদ্দেশ্য ছিল।

আগেই বর্ণিত হয়েছে, 'সেবা'র লোকজন সুর্য্যকে সেজদা করত, কিন্তু কুর'আন একটি গুরুত্বপুর্ন সত্যের প্রতি মনোযোগ টেনেছেন, কুসংস্কারময় এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা, যে কিনা একে করে মানুষের কাছে আকর্ষনীয় আর তাদেরকে সত্য পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়, সে শয়তান।

وَجَدتُّهَا وَقَوۡمَهَا يَسۡجُدُونَ لِلشَّمۡسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيۡطَـٰنُ أَعۡمَـٰلَهُمۡ فَصَدَّهُمۡ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمۡ لَا يَهۡتَدُونَ

আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্ত্তে সুর্য্যকে সেজদা করছে। শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যাবলী সুশোভিত করে দিয়েছে। অতঃপর তাদেরকে সৎপথ থেকে নিবৃত্ত করেছে। অতএব তারা সৎপথ পায় না। [৭৭]

অতএব, কুসংস্কারময় ধর্মগুলি আল্লাহ্‌র প্রেরিত ধর্ম বাণীর উল্টো অবস্থানে থাকে আর তারা নির্ভর করে শয়তানের প্ররোচনা উপর, যে সবটুকু শক্তি দিয়ে সবকিছুই করে আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষের সমর্পনের বিরুদ্ধে। কিন্তু শয়তান নিজে জানে সুর্য্য আল্লাহ নয় যাকে উপাসনা করা যায় আর আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন সুর্য্যকে যেমনভাবে তিনি পুরো বিশ্ব ভ্রমান্ডকে বানিয়েছেন।

আর এইভাবে, ডারউইনবাদী ধর্ম তৈরি হয়েছে ‘বিবর্তন প্রক্রিয়া’ বা বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রয়োজনে নয়। আসলে, বিশ্লেষণের জন্য ‘বিবর্তন প্রক্রিয়া’ বলে কিছু নেই। এই ভ্রান্ত ধর্মের আসল উদ্দেশ্য হোল মানুষকে আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস থেকে সরিয়ে রাখা। আর এই জন্যই এর একজন বিশেষ সমর্থক, জুলিয়ান হাক্সলি, এই তত্বের বৈষয়িক উদ্দেশ্যকে এইভাবে বিবরন দেনঃ

> ধর্ম হচ্ছে মুলত এই দুনিয়ার প্রতি মানুষের সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি। আর এইজন্য বিবর্তন, উদাহরণ হিশেবে, মানুষের বিশ্বাস ও আকাঙ্খায় আল্লাহ তায়ালা বা সৃষ্টিকর্তা যে একটি বিগত ব্যাপার তার একটি শক্তিশালী নৈতিক আবহ তৈরী করতে পারে। [৭৮]

এই তত্বের মুল এবং গুরুত্বপুর্ণ লক্ষ্য হচ্ছে মানবকুলের চিন্তাশক্তির মধ্যে এই প্রতারণার আবির্ভাব ঘটানো যে এই বিশ্ব ভ্রমান্ড আল্লাহ্‌র দ্বারা সৃষ্টি হয় নাই কাজেই মানুষের মধ্যে এই অধীনতা বোধের দায়ীত্ব জাগার কোন কারণ নাই আর ঐশ্বরিক আইন বা নীয়ম নীতি মানারও কোন প্রয়োজন নেই। বিবর্তনবাদীরা প্রায়শই জোর দেয় যে মানুষ তার নিজের ‘প্রভু’ এবং তার নিজের ‘ব্যাবস্থাপক বা রক্ষক’ তার দায়িত্ব শুধুই তার ‘নিজের উপর’।

যে সত্য মানবজাতির কাছে উন্মেষ ঘটানো হয়েছে ইসলাম এবং অন্যান্ন ধর্মের মাধ্যমে ঐশ্বরিক বাণীতে তা হোল আল্লাহ তায়ালা মানবকুলকে সৃষ্টি করেছেন এক কারণেঃ

أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَٰنُ أَن يُتْرَكَ سُدًى (٣٦) أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِىٍّ يُمْنَىٰ (٣٧) ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ (٣٨) فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰٓ (٣٩) أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْۦِىَ ٱلْمَوْتَىٰ (٤٠)

মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে? সে কি স্খলিত বীর্য ছিল না? অতঃপর সে ছিল রক্তপিন্ড, অতঃপর আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করেছেন। অতঃপর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন যুগল নর ও নারী। তবুও কি সেই আল্লাহ মৃতদেরকে জীবিত করতে সক্ষম নন? [৭৯]

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং জীবন দিয়েছেন এই পৃথিবীতে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যেখানে তারা পরিক্ষিত হবে। আর এই সময়কালে মানুষ সমস্ত কর্ম যজ্ঞের জন্য দায়ীত্ব নেবে, সমস্ত বাক্য বিনিময় অথবা যা কিছু লিখিত আকারে প্রকাশ করবে, প্রতিটি ভাবনা চিন্তা যা তার মনে আবর্তিত হবে; অবশ্যই মানুষ তার সৃষ্টি কর্তার কাছে দায়ী থাকবে।
অতএব, যারা এই বিবর্তনবাদী ধর্মের প্রভাবের মধ্যে এসেছে, এমনকি যারা এর উদগ্র পৃষ্ঠপোষক বা সহায়তাকারী হয়েছে, তাদেরকে অবিলম্বে এর মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। এটা প্রয়োজন যে তারা তাদের মহৎ দায়ীত্ব উপলব্ধি করে, মাথা অবনত করে আর আল্লাহ তায়ালা বা আমাদের প্রভুর কাছে সমর্পন করে নিজেকে। নতুবা তারা গোড়ামীর আবর্তে বদ্ধ ধারণায় রয়ে যাবে, এক ভ্রান্তিময় জীবন নির্বাহ করবে এক কুসংস্কারময় ধর্মের অধীনেঃ

وَإِن يَرَوْا۟ كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا۟ بِهَا وَإِن يَرَوْا۟ سَبِيلَ ٱلرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا۟ سَبِيلَ ٱلْغَىِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا وَكَانُوا۟ عَنْهَا غَٰفِلِينَ (١٤٦)

যদি তারা সমস্ত নিদর্শন প্রতক্ষ করে ফেলে, তবু তা বিশ্বাস করবে না। [৮০] আর যদি হেদায়েতের পথ দেখে, তবে সে পথ গ্রহণ করে না। অথচ গোমরাহির পথ দেখলে সেটাই গ্রহণ করে নেয়। এর কারণ, তারা আমার নিদর্শনসমুহকে মিথ্যা বলে মনে করেছে এবং তা থেকে বেখবর (অবহেলা) রয়ে গেছে। [৮১]

অপ্রত্যাশিত বা অযাচিতভাবে একদিন তারা তাদের হিসেব চুকাবার দিনে এসে উপনিত হবে, আর যে হিসেবকে তারা বরাবরই অস্বীকার করে আসছে তার মুখোমুখি তাদের হতে হবে, আর এর ফলাফলও তাদের ভোগ করতে হবে।

References

Abel, Ernest L., *Ancient Views on the Origin of Life*, Farleign: Dickinson University Press, 1973.

Anderson, J.N.D., *World's Religions*, London: Inter-Varsity Fellowship, 1950.

Barzun, Jacques, *Darwin, Marx, Wagner*, Garden City, NY: Doubleday, 1958.

Behe, Michael, *Darwin's Black Box*, New York: Free Press, 1996.

Darwin, Charles, *The Origin of Species*, 6th edition, London: John Murray, 1882.

Darwin, Charles, *The Origin of Species: A Facsimile of the first Edition*, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1964.

Darwin, Charles, *The Origin of Species by Means of Natural Selection*, New York: The Modern Library, 1993.

Darwin, Charles, *The Life and Letters of Charles Darwin*, vols. I and II, New York: D. Appleton and Company, 1888.

Denslow, William R., *10,000 Famous Freemasons, Vol*. 1, Richmond, Virginia: Macoy Publishing & Macoy Supply co., Inc., 1957.

Denton, Michael, *Evolution: A Theory in Crisis*, London: Burnett Books, 1985.

Eiseley, Loren, Darwin's Century, New York: Doubleday, 1961.

Fox, Sidney and Dlaus Dose, *Molecular Evolution and the Origin of Life*, San Francisco: WH. Freeman and Company, 1972.

Futuyma, Douglas J., *Science on Trial*, New York: Pantheon Books, 1983.

Gillespie, N.C., *Carles Darwin and the Problem of Creation*, Chicago: University of Chicago Press, 1979.

Grasse, Pierre P., *Evolution of Living Organisms*, New York: Academic Press, 1977.

Hitching, Francis, *The Neck of the Giraffe: Where Darwin Went Wrong*, New York: Ticknor and Fields, 1982.

Huxley, Julian and Jacob Bronowski, *Growth of Ideas*, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc., 1968.

Huxley, Julian, "Evolution and Genetics," Chapter 8 in *What is Science*?, edited by J.R. Newman, New York: Simon and Schuster, 1955.

Johnson, Phillip E., *Darwin on Trial*, 2nd ed., Downers Grove, Illinois: Interversity Press, 1993.

Johnson, Phillip E., *Defeating Darwinsim by Opening Minds*, Illionis: Intervarsity Press, 1997.

Kelso, A.J., *Physical Anthropology*, 1st ed., New York: J.B. Lipincott Co., 1970.

Leakey, M.D., *Olduvai Gorge*, vol. 3, Cambridge: Cambridge University Press, 1971.

McLean, Glen S., et al., *The Evidence for Creation: Examining the Origin of Planet Earth*, Sprindale: Whitaker House, 1977.

Morris, Henry M., *The Long War Against God*, Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1996.

Oldroyd, D.R., *Darwinian Impacts*, Atlantic Highlands, NJ: Humanities Press, 1983.

Oparin, Alexander I., *Origin of Life*, New York: Dover Publications, 1936, 1953 (reprint).

Popper, Karl, *The Philosophy of Karl Popper*, vol. 1, ed., P.A. Schilpp, La Salle, IL: Open Court Publishers, 1974.

Ranganathan, B.G., *Origins?* Pennsulvania: The Banner of Truth Trust, 1988.

Sagan, Carl, *Cosmos*, New York: Wings Books, 1980.

Watts, Newman, Why Be An Ape…?, London: Marshall, Morgan & Scott, LTD., 1936.

Zuckerman, Solly, *Beyond the Ivory Tower*, New York: Taplinger Publishing Company, 1970.

NOTES

1. Particularly, *The Evolution Deceit: The Scientific collapse of Darwinism and its Ideological Background*, 8th updated edition, Taha Publishers, London, 2003 and *Darwinism Refuted: How the Theory of Evolution Breaks Down in the Light of Modern Science*, Goodword Books, New Delhi, 2003.
2. "Darwin's Death in South Kensington," Nature, February 26, 1981, vol. 289, p.735.
3. Francisco A yala, "Nothing in Biology Makes Sense Except in the Light of Evolution: Theodosius Dobzhansky, 1900-1975," Journal of Heredity, vol. 68, no. 3, 1977, p. 3.
4. G.W. Harper, "Alternatives to Evolutionism," *School Science Review*, vol. 51, Sept., 1979, p.16.
5. Ernst Mayr, "evolution," Scientific American, vol. 239, Sept., 1978, p. 47.
6. Julian Huxley, "Evolution and Genetics," Ch. 8 in What is Science?, pp. 272 and 278.
7. The Philosophy of Karl Popper, vol. 1, pp. 143 and 183.
8. The Long War Against God, p. 127.
9. L.C. Birch and P.R. Ehrlich, Nature vol. 214, 1967, p. 369.
10. *The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition*, p. 179.
11. Umit Sayin, "uctu Uctu Dinozor Uctu" (The Dinosaur is Just About to Fly"), Bilim ve Utopya, November, 1998.
12. Darwin on Trial, p. 128.
13. Surah Ghafir, 40:29.
14. Why Be An Ape…? www.picknowl.com.au/homepages/rlister/ sermons/ape/ape.htm
15. M. Grene, Encounter, Nov., 1959, pp. 48 – 50
16. Surah al-Anbiyaa, 21: 18.
17. Dr. Kenneth Cumming, "The Collapse of the Theory of Evolution, the Fact of Creation," conference speech, April 4, 1998.
18. Osman Gurel, "Yasamin Kokeni" ("The Roots of Life"), Pan Yayincilik, October, 1999, p. 4.
19. http://buglady.clc.uc.edu/biology/bio106/earlymod.htm
20. *A Reasoned Look at Asian Religions*, pp. 87-88; World's Religions, p. 108.
21. For Detailed information see Harun Yahya's *The Evolution Deceit*: *The Scientific Collapse of Darwinism and Its Ideological Background*, 8th updated edition, Taha Publishers, London, 2003 and *Darwinism Refuted: How the Theory of Evolution Breaks Down in the Light of Modern Science*, Goodword Books, New Delhi, 2003.
22. Surah Maryam, 19:42.
23. Surah an-Naml, 27: 24:25.
24. Surah Fussilat, 41:37.
25. Cosmos, p. 243.
26. Surah an-Naml, 27: 24.
27. *The Long War Against God*, pp. 220 – 224.
28. *Darwin's Black Box*, pp. 232-233

29. Surah Qaf, 50: 6-11.
30. http://biology.clc.uc.edu/courses/hio106/earlymod.htm
31. www.the darwinpapers.com/oldsite/Number2/Darwin2Html.htm
32. www.forerunner.com/forerunner/X0742_Philosophical_origin.html
33. Darwinian Impacts, p. 23 and p. 32.
34. Darwin's Century, p. 283
35. Surah al-A'araf, 7: 132.
36. Surah al-An'aam, 6: 111.
37. Surah al-Hijr, 15: 14-15
38. Surah al-A'aaraf, 7: 179.
39. For more details on the collapse of Darwinism in the face of science, refer to Harun Yahya's *The Evlolution Deceit: The Scientific Collapse of Darwinism and Its Ideological Background*, 8th updated edition, Taha Publishers, London, 2003 and *Darwinism Refuted: How the Theory of Evolution Breaks Down in the Light of Modern Science*, Goodword Books, New Delhi, 2003.
40. *The Life and Letters of Charles Darwin*, vol. II, p. 501.
41. *The Life and Letters of Charles Darwin*, vol, I, p. 395.
42. *The Life and Letters of Charles Darwin*, vol. II, p.25.
43. *The Origin of Species*, 6th Edition, p. 204.
44. *Charles Darwin and the Problem of Creation*. P. 2.
45. H.S. Lipson, *"A Physicist's View of Darwin's Theory," Evolution Trends in Plants*, vol. 2, no. 1, 1988, p. 6.
46. *The Evidence for Creation: Examining the Origin of Planet Earth*, p. 94.
47. *The Long War Against God*, p. 178.
48. Pope Leo XIII, Humanum Genus, Encyclical on Freemasonry, promulgated on April 20, 1884, www.newadvent.org/docs/le13hg.htm
49. *Freemasonry Today*, Autumn, 1999, Issue 9, p. 5.
50. *The Long War Against God*, p. 198. The "Illuminati" organization established in Bavaria, Germany, in 1776 was a kind of Masoic lodge. The founder of the lodge, Adam Weishaupt (who was of Jewish descent), listed the goals of the organization in this way; 1) The abolishment of all monarchies and methodical governments, 2)The abolishment of personal properties and inheritance, 3) The abolishment of the family and marriage, and the establishment of a communal educational system for children, and 4) The abolishment of all theistic religions. (See Eustace Mullins, *The World Order: Our Secret Rulers*, p. 5; Lewis Spence, The Encyclopedia of the Occult, p. 223.)
51. The Long War Against God, p. 198.
52. 10,000 Famous Freemasons, vol. 1, p. 285.
53. It is also now accepted by evolutionist biologists that variations called "microevolution" do not cause "macroevolution"; that is, they do not supply any explanation for the origin of species. The renowned evolutionist paleontologist, Rower Lewin, describes the conclusion reached in a four-day symposium

held at Chicago's Field Museum of Natural History in 1980 in these words: "The central question of the Chicago conference was whether the mechanisms underlying microevolution can be estrapolated to explain the phenomena of macro evolution. … the answer can be given as a clear 'No'."

54. R. Lewin, "Evolutionary Theory Under Fire," Sciences, vol. 210, 21 November, 1980, p. 883.
55. Surah al-Hashr, 59: 24.
56. *Defeating Darwinism by Opening Minds*, p. 99.
57. *Darwin on Trial*, p. 155.
58. *The Life and Letters of Charles Darwin*, vol. II, p. 388.
59. *The Life and Letters of Charles Darwin*, vol, II, pp. 42-43.
60. *Darwin, Marx, Wagner*, p. 69.
61. *The Long War Against God*, p. 156.
62. *Evolution of Living Organisms*, p. 107.
63. *Origins*?, p . 7.
64. *Evolution of Living Organisms*, p. 103.
65. *Evolution: A Theory in Crisis*, p. 351.
66. *The Life and Letters of Charles Darwin*, vol. II, p. 105.
67. *The Life and Letters of Charles Darwin*, vol. II, p. 146.
68. *The Life and Letters of Charles Darwin*, vol. I, p. 455.
69. *The Long War Against God*, p. 191.
70. Surah an-Nahl, 16:24
71. For more details refer to Darwinism Refuted: *How the Theory of Evolution Breaks Down in the Light of Modern Science*, Goodword Books, New Delhi, 2003.
72. Surah al-Baqarah, 2: 164.
73. Surah Al Imran, 3: 191.
74. Surah al-Qahf, 18: 56.
75. For more details, see *The Evolution Deceit* by Harun Yahya.
76. *The Neck of the Giraffe: Where Darwin Went Wrong*, p. 204.
77. Surah an-Naml, 27: 24.
78. *Growth of Ideas*, p. 99.
79. Surah Al-Qiyamah, 75: 36-40.
80. i.e., reason and integrity.
81. Surah al-A'araf, 7: 146.

16/5/2015